Third Lane

Special Issue #2

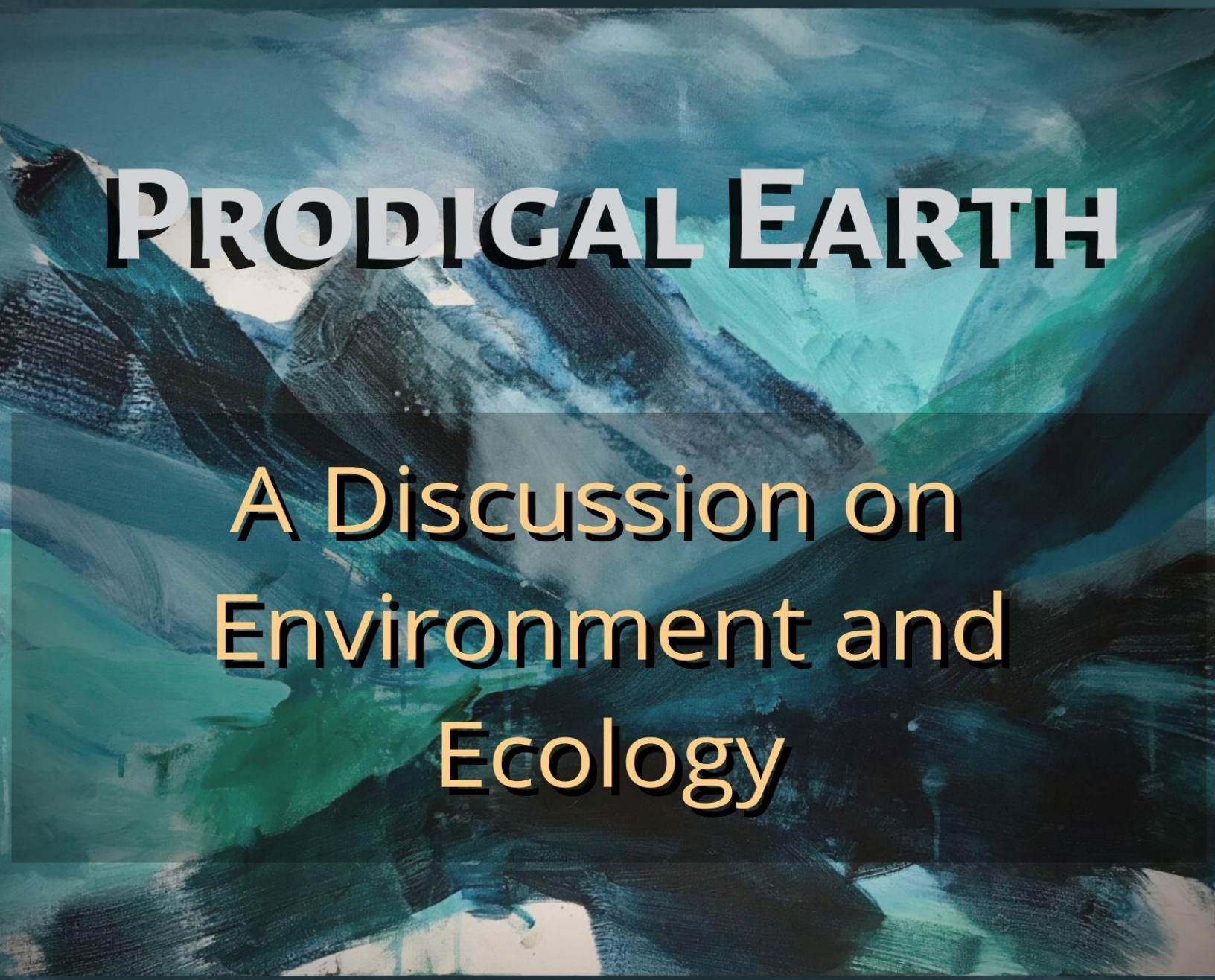

Prodigal Earth

A Discussion on Environment and Ecology

Sept '21

Prodigal Earth:
A Discussion on Environment and Ecology

জলবায়ু বিপর্যয়:
পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র - আপন্ন জীবনের দিনলিপি

Special Series Vol. II

বিশেষ সংখ্যা - ২

©

Copyright 2021 by Third Lane Magazine

All rights reserved. No part of this document may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems without permission in writing from the publisher. For information, contact: thirdlane.mag@gmail.com

Issue Contributors

Essays:

Dhruba Dasgupta
Debojyoti Das
Gouranga Nandy
Dr. Nairwita Bandyopadhyay
Dhurjatiprasad Chattopadhyay
Vasundhara Bhojvaid
Ankit Prasad
Annu Jalais

Illustration:

Caroline Wampole (Cover)

Bob & Bobby

Swagata Bose

Oddbjørg Reinton

Issue Curated by:

Priyanjana Majumder

M.D. Mahasweta

Saikat Palit

Table of Contents

Editors' Note 6

Troubled Waters: Conservation Narratives from Endangered Ecosystems

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি: শৌচ তথা নিকাশী ব্যবস্থা, কারিগরি বিদ্যা এবং ইকোলজির সমন্বয়সাধন – ধ্রুবা দাশ গুপ্ত 11

Sundarbans: The Land of Eighteen Tides – Debojyoti Das 41

পরিবেশগত উদ্বাস্তু: বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন জনপদে উদ্বাস্তু মানুষের ঢেউ - গৌরাঙ্গ নন্দী.....56

Storms And Droughts: The Lesson in Disasters

Dushkal: A Study In Climate Change Risk Perception From The Fields Of Gujarat – Dr. Nairwita Bandyopadhyay 72

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দক্ষিণবঙ্গের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা – ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 85

Beyond Human: Re-Thinking the Climate Crisis

It's In the Air: Taking the Human-Atmospheric Relationship Seriously – Vasundhara Bhojvaid.....92

Cli-Fi: A Polemic – Ankit Prasad.....107

The Human and The Nonhuman: 'Socio-Environmental' Ecotones and Deep Contradictions In The Bengali Heartland – Annu Jalais.....125

Author Index 147

References 150

Editor's Note

Our planet is dying. Well, not entirely, but it is certainly on its way to becoming completely uninhabitable to a range of plant and animal species, human beings included. Our temperatures are rising at an alarming rate. Within the next twenty years, it is expected to rise more than 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, which was the limit agreed upon by the Paris Accord of 2015. In an intricately interconnected planetary system, one thing often leads to another. So, our sea levels are also rising as the polar ice caps melt, there are disastrous wildfires in various parts of the world. While some areas are witnessing droughts, others are submerged underwater due to heavy rainfall. This isn't the first time, though. There have been significant changes in the planetary climate before, even global warming. Human civilization came around after the last ice age ended around 11,700 years ago. Then why should we be scared? Because this time around, it is an exclusively anthropogenic climate change, meaning that it is almost entirely the result of human activities. Also, it was never this fast. Climate change happened over thousands of years and even then, it would always be accompanied by mass extinctions. Indeed, according to researchers, the sixth mass extinction is well under way with species disappearing faster than ever before, restructuring our ecologies for the worse. What is awaiting us is complete chaos and potential annihilation. The COVID-19 pandemic is only a teaser to what is to come, it seems.

Since its inception in 1988, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has provided '…regular scientific assessments on climate change, its implications and potential future risks, as well as…adaptation and mitigation options.' The IPCC periodically produces Assessment Reports which summarise the state of 'knowledge' on climate change at that given point of time. It is currently in its sixth assessment cycle. Of the three working groups contributing to the report, the first one has released its findings and it immediately made waves across the world, in both scientific circles and among the masses. It reinforced the culpability of human activities in ushering in climate change, mostly through

indiscriminate emissions of greenhouse gases or (GHG). It stated categorically that not a single region on Earth remained untouched by these disastrous anthropogenic changes. And, if we didn't bring down GHG emissions immediately, this was it for us.

Things look bleak, but there is time yet. Even now, there are many futures open before us and our actions in the 'now' will decide where we will end up. We need to rethink our relationship to the world and the 'resources' we extract from it, recalibrating the 'value' of the environment. The capitalist celebration of unbridled consumption must be critiqued and alternative systems of production, consumption and conservation must be conceptualized while avoiding obvious pitfalls such as the rallying cry of ecofascism. We must forge new and more intersectional ways of looking at and dealing with our planet, our Prodigal Earth, taking into account identity politics as well as various forms of social inequalities. It is a daunting project with a mind-boggling range of variables, but, it needs to be attempted, urgently. Third Lane's special issue on climate change represents an attempt at thinking critically and finding solutions to this crisis, no longer looming, but present. The authors, experts in their respective fields, illustrate various pathways to the future by highlighting the effects of climate change in the present and our responses to the same. From extreme weather events like cyclones and droughts, to extraordinary natural and climate-friendly sewage treatment infrastructures in the form of the East Kolkata Wetlands, from cultural responses such as cli-fi to socio-political issues like that of climate refugees, these eight original essays present a compelling account of the strange times we are living in and possible futures, both good and bad.

The stakes have never been higher, the time has never been more right.

*****

মুখবন্ধ

পাশ্চাত্যধর্মী পলিটিকাল চিন্তাধারায় ব্যক্তিমানুষের অধিকার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে নেয় যে অনেকসময়ই ব্যক্তির সাথে তার প্রতিবেশের সম্পর্কের বিষয়টি থেকে যায় অনালোচিত। সম্প্রতি উত্তর মানবিক চিন্তাধারায় যে বিষয়টি উঠে আসছে তা হলো এনথ্রোপোসেন্ট্রিক চিন্তাভাবনা থেকে সরে এসে মানুষকে এই বৃহৎ প্রাণমণ্ডলের (বায়োস্ফিয়ারের) অংশ হিসেবে ভাবা। এই চিন্তাবলম্বীদের মতে 'নেচার' এবং 'কালচার' - এই দুইয়ের মধ্যে তৈরী হওয়া বিভাজনে আদতে মনুষ্যসমাজের ক্ষতি বই লাভ কিছু হয়নি। মানুষ যদি প্রকৃতির অংশ হয়, তবে তার প্রকৃতিকে জয় করার প্রশ্ন ওঠেনা। আসলে মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে স্বপ্ন - তার সাথে জড়িত থাকে উন্নয়নের প্রশ্ন; যে উন্নয়নের সাথে আধুনিকতার সম্পর্ক নিবিড়। আর ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আধুনিকতার প্রাদুর্ভাব বহুলাংশে ইউরোপ প্রভাবিত। ফলত আধুনিকীকরণের অন্তর্গত নৈতিকতা এবং ভারতের মতো দেশে তার প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা নিয়েও অনেক প্রশ্ন স্বাধীনতার পর থেকেই উঠেছে।

সারা পৃথিবী জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট দিনে দিনে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এর সাথে সাথেই জলবায়ু রাজনীতির গতিপ্রকৃতি আর পরিবেশ নিয়ে চিন্তাচর্চার ধারাতেও দেখা যাচ্ছে বিবিধ বাঁকবদল। ১৯৬২ সালে রাচেল কার্সনের 'সাইলেন্ট স্প্রিং' প্রকাশিত হলে আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান নিয়ে ভাবনাচিন্তায় আমূল পরিবর্তন আসে । পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ আন্দোলনগুলিতে জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও সেই ঢেউ এসে পৌঁছয়; পরিবেশ আন্দোলনের মৌলিক প্রশ্নগুলি রাজনীতিকেও প্রভাবিত করতে আরম্ভ করে।

আসলে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই এই জলবায়ু পরিবর্তনের সময়ে খুব অসুরক্ষিত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার জলবায়ু রাজনীতি উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের প্রশ্নেই আলোড়িত হয়, চাপা পড়ে যায় পরিবেশজনিত বিপর্যয় ও তার সাথে লগ্ন হয়ে থাকা গণমানুষের আখ্যান।

থার্ড লেনে পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ সংখ্যায় এবারে থাকছে জলবায়ু বিপর্যয় বিষয়ক একগুচ্ছ প্রবন্ধ। প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সামাজিক- সাংস্কৃতিক স্তরেও পরিবেশকে নিয়ে যে চিন্তাভাবনা - তার ইঙ্গিত উঠে এসেছে এবারের লেখকদের কলমে । সুন্দরবন ব-দ্বীপ অঞ্চলে মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সহাবস্থান (ecotone) যে আশ্চর্য সংস্কৃতির জন্ম দেয় (বনবিবি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় নির্বিশেষে পূজিত হন) সেই প্রবন্ধের পাশাপাশি থাকছে বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন জনপদে পরিবেশ-উদ্বাস্তুদের মর্মন্তুদ জীবনধারণের কথা। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস - গুজরাটের খরাপ্রবণ অঞ্চলের অধিবাসীদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা - দিল্লীসহ অন্যান্য মেট্রোপলিটানগুলিতে বায়ুদূষণ ও তার ভয়াবহ পরিণতি - এছাড়াও নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ-বিপর্যয়ঘটিত মনোজ্ঞ আলোচনা ও বিশ্লেষণ। লেখকরা প্রত্যেকেই পরিবেশ বিষয়ক লেখালেখি ও আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পড়ুন- পড়ান- বাড়ির ছোটদের পরিবেশকে ভালোবাসতে শেখান।

সবাই সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন। সকলকে শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

*****

CLIMATE CHANGE ISN'T REAL
BOB & BOBBY

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি: শৌচ তথা নিকাশী ব্যবস্থা, কারিগরি বিদ্যা এবং ইকোলজির সমন্বয়সাধন

ধ্রুবা দাশ গুপ্ত

পূর্ব কোলকাতার জলাভূমি : ধ্রুবা দাশ গুপ্ত

কলকাতা শহরের অপরিহার্য ঐতিহ্য, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। সারা বিশ্বে স্বীকৃত এই আংশিক প্রকৃতি-ভিত্তিক, আংশিক মানব-সৃষ্ট জলাভূমিটি ময়লা জল ব্যবহার করে একটা টেঁকসই পরিশোধন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। ২০১৭ সালে প্রকাশিত রাষ্ট্র-সংঘের World Water Development Report এর চর্চার বিষয় ছিল ময়লা জল বা wastewater। এই রিপোর্টে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে যে এই জলাভূমি যৎসামান্য খরচায় সম্পূর্ণ প্রকৃতি-নির্ভর উপায়ে, এলাকার জলাভূমি সমাজের উদ্যোগে ময়লা জল পরিশোধন করে। একই সঙ্গে এই রিপোর্ট উল্লেখ করেছে যে সারা বিশ্বে এখনও কেবলমাত্র ২০ শতাংশ ময়লা জল পরিশোধন করা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমানে জল সংকটাপন্ন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। বহু শহরে পানীয় জলের অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে আছে। বারবার বহু বিশেষজ্ঞ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাবধান বাণী দিচ্ছেন যে নদী তথা অন্যান্য জলাধারের উপযুক্ত ব্যবহার, পাশাপাশি ময়লা জলের ও উপযুক্ত ব্যবহার হওয়া উচিত। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির উপযোগিতা, বহমানতা এবং গুরুত্ব নিয়ে মূল্যায়ন যথেষ্ট সময়োপযোগী হবে। কলকাতা এমন একটি ক্রান্তীয় শহরের দৃষ্টান্ত যেখানে সূর্যরশ্মির প্রাচুর্য গৃহস্থের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ময়লা জল (domestic sewage) নদীতে ফেলে দেওয়ার আগে যৎসামান্য খরচায় পরিশোধন করতে সাহায্য করে। শহরবাসীদের এর জন্য আলাদা করে কোন কর দিতে হয় না, যান্ত্রিক উপায়ে ময়লা জল পরিশোধনের খরচটা বেঁচে যায়। নগর পরিকল্পনায় এই বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিদ্যাধরী নদী আমাদের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। প্রকৃতির নিয়মে নদী থাকলেই তার পাশে জলাভূমি থাকবেই। জলাভূমি যেন নদীর আদরের সন্তান, নদীর জলে লালিত-পালিত হয় সে। আর নদী মরে গেলে সেও প্রাণ হারায়। নোনা জলের জোয়ার-ভাটা খেলা নদী বিদ্যাধরীর জলাভূমি সন্তান ছিল লবণ হ্রদ, যা Salt Lake নামে পরিচিত। এই নদী ব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ল তখন Salt Lake এর ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়াল এই এলাকার বহু মৎসচাষীর জীবন ও জীবিকা। এখানেই মানুষের সৃজনশীলতা একটি অসামান্য ভূমিকা পালন করল। দূরদর্শী বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার ড: বীরেন্দ্র নাথ দে নতুন নিকাশী ব্যবস্থা সৃষ্টি করে শহরের মাটির নীচের নিকাশী নালাকে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া নিকাশী ব্যবস্থার সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দিলেন যে সারা বছর ময়লা জলের যোগান পেয়ে জলাভূমির চরিত্র পাল্টে গেল। সে এবার নোনা জলের জলাভূমির থেকে পাল্টে ময়লা জলের জলাভূমি হয়ে উঠল, তাতে বিপুল সংখ্যক মৎস চাষীর ভবিষ্যত অক্ষত থাকল। এবং এটাই পূর্ব কলকাতার জলাভূমির বিবর্তনের কাহিনী, যা এই লেখার মার্‌ফৎ কথার জাল বুনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই লেখাটি চারটি ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে, যে নিকাশী সমস্যা কলকাতা শহরকে বহুদিন জর্জরিত করেছিল, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপরের ভাগে এই সমস্যা কারিগরি বিদ্যার সাহায্যে এবং এলাকা-বাসীদের প্রচেষ্টায় কিভাবে সমাধান হয়েছে, তা বিস্তারিত বোঝানো হয়েছে। পরবর্তী অংশে ময়লা জল এবং তার পরিশোধন সম্পর্কে কি ধারণা ছিল এবং কিভাবে তার বিবর্তন হয়েছে, তাই নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষে, এই জলাভূমির সংরক্ষণ সম্পর্কিত বাধা-বিপত্তির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে খতিয়ে দেখা হয়েছে যে শহরের পরিকাঠামো কি করে দীর্ঘমেয়াদি হবে, ইতিহাস ঘেঁটে আমরা এই বিষয়ে কি কি শিক্ষা পেতে পারি।

ইতিহাসের কথা –

ভারতবর্ষে আসার অব্যবহিত পরেই চতুর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা দেশের নদীপথগুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে থাকে এবং সেই বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। কলকাতাকে ইংরেজরা রাজধানী হিসেবে বেছে নিয়েছিল, তাই ব্যবসা-বাণিজ্য সুচারু ভাবে চালু রাখার জন্য, বিশেষ করে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির ব-দ্বীপের পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা খুবই প্রয়োজন ছিল। এর জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল শহরের কাছে নদীর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদী বলতে শহরের কাছে ছিল বিদ্যাধরী নদী (কে নাম দিয়েছিল কে জানে!)। পূর্ব বাংলার ব-দ্বীপ তখন অনেকটাই পরিপক্ক হয়ে গিয়েছে (mature delta) কিন্তু পশ্চিম বাংলায় সেটা হয়নি। বিদ্যাধরীর কাজ ছিল জোয়ার-ভাটায় পলিমাটি এনে, তার বিভিন্ন শাখা উপশাখার মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং ব-দ্বীপ তৈরীর কাজ সম্পন্ন করা। এই বিদ্যাধরীর সংলগ্ন অনেকগুলি জলাধার / জলাভূমি ছিল – এগুলি নোনা জলের জলাভূমি ছিল, যাদের ইংরেজরা নাম দিয়েছিল Salt Lakes বা লবণ হ্রদ। বিদ্যাধরীর একটি বড়শাখা (spill channel) ছিল Central Lake Channel – এইটি বিংশ শতাব্দীর গোড়া অবধি কলকাতা শহরের নিকাশী বহন করে সুন্দরবনের দিকে যেত। বিদ্যাধরীর আর্বিভাব সুন্দরবনে, তারপর এটি হাড়োয়া দিয়ে বইত এবং হাড়োয়া গাঙ নামে পরিচিত ছিল। এর পরবর্তীতে এটি পশ্চিম দিকে গমন করে, এবং নোনা খাল বলে একটি ছোটো নদী এর সঙ্গে এসে মেশে। তারপর বিদ্যাধরী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিয়ে বেলেঘাটা খাল এবং টলির নালার সংযোগ-স্থলে পৌঁছায়, সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে মাতলা নদীর সঙ্গে মিশে যায়।

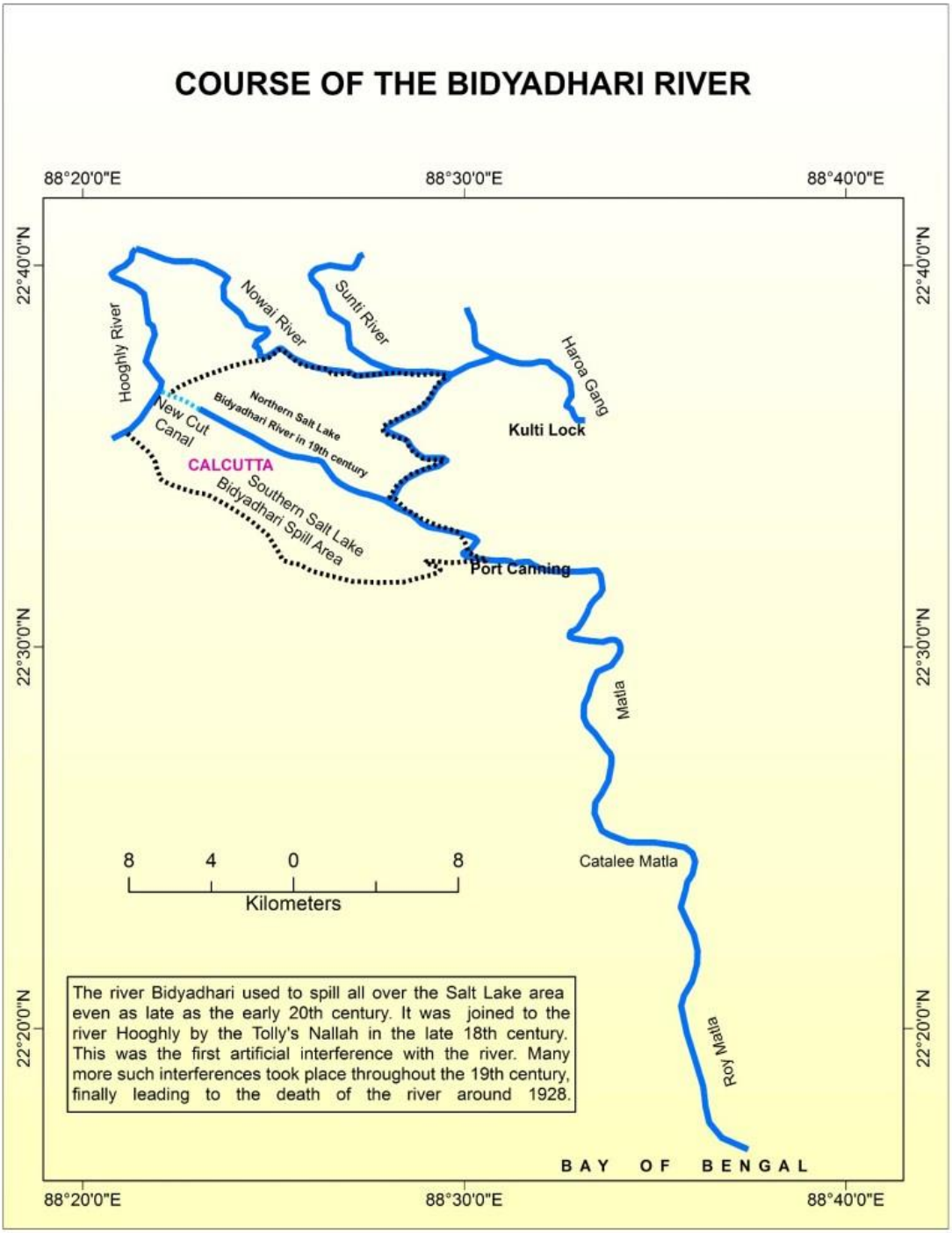

প্রথম ম্যাপ – বিদ্যাধরীর যাত্রাপথ

বিদ্যাধরীর প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে একটি বাণিজ্যের উপযুক্ত জলপথ গড়ে উঠল, এই পথে কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা পোক্ত হল। প্রথম এল ১৭৭৫ – ৭৭ সালে টলির নালা – মেজর উইলিয়াম টলি এই খালটি নিজের খরচে খনন করেছিলেন। এইটি

পুরানো আমলে আদি গঙ্গা নামে পরিচিত ছিল – এটি গঙ্গার পুরাতন যাত্রাপথ ছিল। মেজর টলি পুরাতন খিদিরপুর ডকের কাছে একটি পূর্ব অবস্থিত খালের মুখ এবং বিদ্যাধরী নদীর উপর তারদহের কাছে আর একটি খালের মুখ আবিষ্কার করে এই দুটিকে জুড়ে দিয়েছিলেন, এইভাবে টলির নালা তৈরী হল। এই খালটি দিয়ে নৌকা পার হতে গেলে মেজর টলিকে কর দিতে হত। এর আগে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সমস্ত নৌকা পূর্ববঙ্গ থেকে আসতে গেলে সুন্দরবনের নদী-নালা হয়ে আসতে হত, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। এই জলপথ কে বলা হত Outer Boat Route. জলপথে যাতায়াতের জন্য কলকাতার কাছে আর একটি খাল ছিল যার নাম Old Eastern Canal – এইটিও Salt Lake এর মধ্যে দিয়ে এসে কলকাতা শহরে ঢুকত। এইটি ধাপা এলাকার থেকে Entally পর্যন্ত আসত এবং এই খালটিকে Entally Canal অথবা বেলেঘাটা খাল (Beliaghata Canal) বলা হত। বেলেঘাটা নামটি ধাপার কাছে বালিয়াঘাট নামের গ্রাম থেকে নামকরণ হয়েছিল।

East India Company যখন ভারতবর্ষে আসে তারা বিভিন্ন শহর বেছে নেয় এবং আনুষঙ্গিক এলাকা প্রশাসনের জন্য Presidency আখ্যা দিয়ে এই সব জায়গায় প্রশাসনিক পরিকাঠামো তৈরী করে। Calcutta Presidency তৈরী হয় Madras Presidencyর পরেই। Calcutta Presidency এলাকায় সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে যেই কাজ করা হয়, তার দায়িত্বে ছিল Military Board। এই Military Board এর অধীনে একটি পদ ছিল খাল রক্ষণাবেক্ষণ করা যার দায়িত্বে ছিলেন Superintendent of Canals। এই পদে নিযুক্ত Lieutenant J.A, Schalch ১৮২১ সালে প্রস্তাব দেন যে গ্রীষ্মকালে জলপথে যাতায়াত করার জন্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোরজন্য একটি খাল পরিকাঠামো তৈরী করা হোক। এতে বঙ্গদেশের পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে চলাচলকারী নৌকার থেকে যে জলকর পাওয়া যাবে, তাতে খাল খননের খরচ দ্রুত উঠে আসবে এবং কোম্পানির ঘরে যথেষ্ট পরিমানে অর্থ রোজগার হবে। খুলনায় গড়াই নদী এবং কলকাতার চিৎপুরে হুগলী নদীকে, পরপর বয়ে যাওয়া বেশ কিছু চালু খাল এবং কিছু নতুন খনন করা খাল জুড়ে বাণিজ্য পথে যুক্ত করা হবে, এমনই চিন্তাভাবনা করা হয়ছিল।

টলির নালা তখন খুবই নৌকাবহুল খাল ছিল, এবং সেই ভারাক্রান্ত অবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য Schalch প্রস্তাব দেন যে চিৎপুর থেকে বেলেঘাটা খাল পর্যন্ত তৎকালীন Circular Road এর সমান্তরালে একটি খাল খনন করা হোক, যার নাম দেওয়া হল Circular Canal, যদিও এটি গোলাকৃতি ছিল না। এই খালটি বেলেঘাটা খালের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জোয়ার-ভাঁটার জন্য চিৎপুরে একটি জল-নিয়ন্ত্রক গেট বা Lock Gate তৈরী হয় ১৮৩৩ সালে। কলকাতা থেকে বিদ্যাধরী হয়ে তারপর কিছু পুরাতন খাল হয়ে ইছামতি নদীতে পৌঁছে হাসনাবাদ হয়ে পূর্ব বাংলায় পৌঁছানোর

যাত্রাপথ তৈরী হল। চিৎপুর এবং ধাপায় কর দিতে হত সমস্ত পণ্যবাহী নৌকাগুলিকে। ওদিকে Hastings Bridge এর কাছে টলির নালার উৎসমুখে এবং ১১ মাইল পরে পাঁচপোতায় কর আদায় করা হত। পরে টালি নালার যাত্রাপথে আরও কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই দুটি বাণিজ্যপথই নিম্নোক্ত মানচিত্রে দেখানো আছে।

১৮৪৩ সালে বঙ্গ সরকারের (১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজ East India Company কলকাতাকে রাজধানী করে নিজেদের সরকার চালাচ্ছিল)। এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক (Undersecretary) Military Board কে জানায় যে এই বাণিজ্যপথ থেকে সরকার ১৫,১৪,৭৮২ টাকা লাভ করেছে, সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পরে।

এই জলবাহী বাণিজ্যপথ (1814 km, তার মধ্যে 76 km ইংরেজদের খনন করা) বিশ্বের অন্যতম পথ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে – এখান দিয়ে বছরে এক মিলিয়ন টন পণ্যদ্রব্য যাতায়াত করত যার মূল্য ছিল চার মিলিয়ন পাউন্ড (£4 million)। এই বাণিজ্যপথের দ্বারা যেই সব অঞ্চল যুক্ত হয়েছিল সেগুলি হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা, খুলনা, ফরিদপুর এবং বাখেরগঞ্জ (বরিশাল জেলার রাজধানী, এখানে ধান প্রধান ফসল ছিল)। এছাড়া ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় উৎপাদিত খাদ্যশস্য। তাছাড়া অন্যান্য অনেক খাদ্য পণ্য এবং ভোগ্যপণ্য এই জলপথ বেয়ে কলকাতায় আসত। নিম্নোক্ত মানচিত্রে এই বড় ছবিটা বুঝিয়ে দেওয়া আছে।

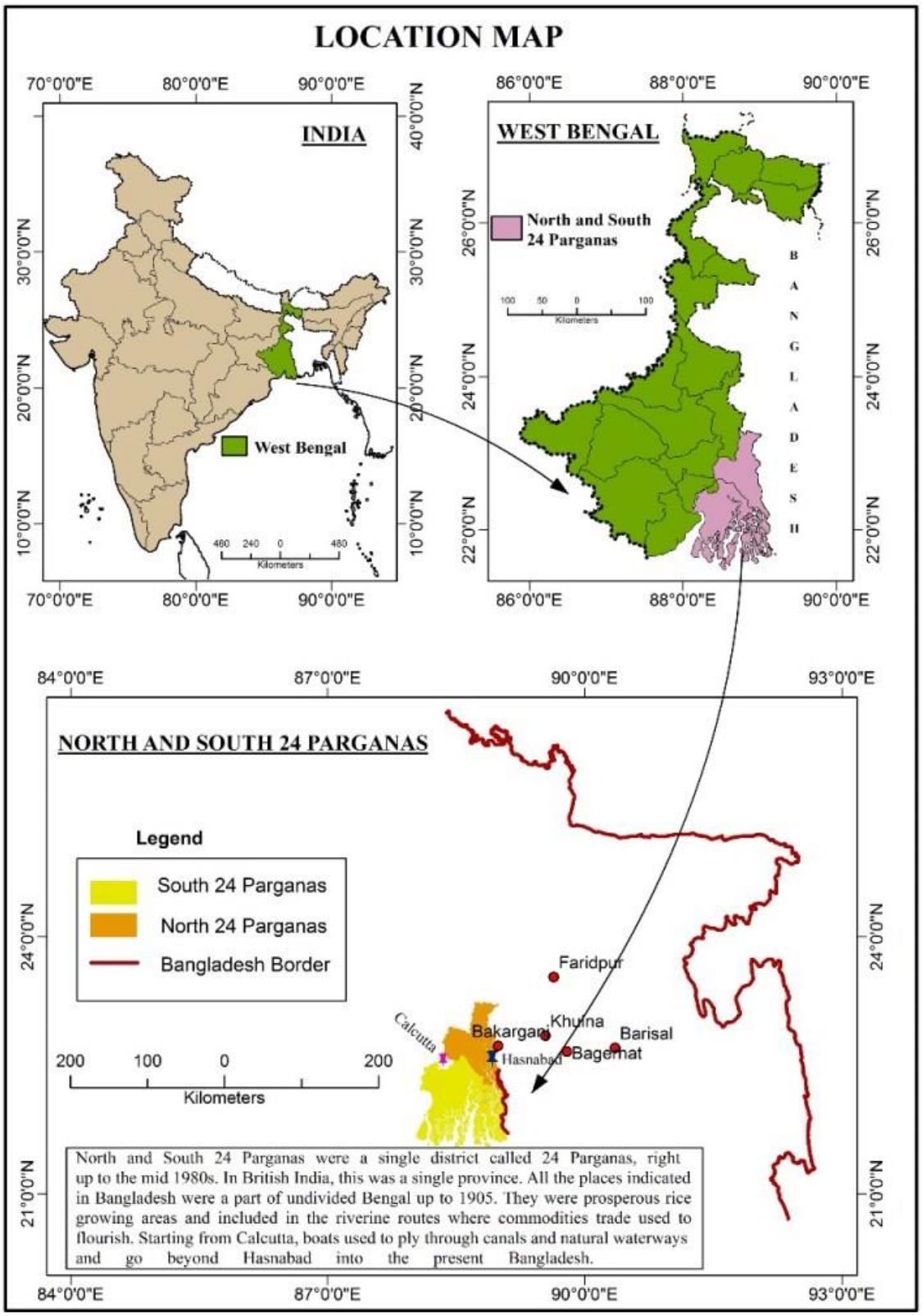

তৃতীয় ম্যাপ -বাণিজ্যপথের বড় ছবি

বিদ্যাধরী: একই সঙ্গে বাণিজ্যপথ ও নিকাশী নালা

টলির নালা এবং সার্কুলার খাল বানিয়েই থেমে থাকেনি ইংরেজরা। ১৮৫৯ সালে তারা New Cut Canal খনন করে। উল্টোডাঙ্গায় এই খালটি Circular Canal এর সঙ্গে যুক্ত হয়, তারপর ধাপা পর্যন্ত যায়। এছাড়াও আরও জল নিয়ন্ত্রক গেট বা Lock Gate ১৮৮৩ সালে ধাপাতে তৈরী হয় এবং চিৎপুরে এই একই সালে পুরাতন Lock Gate পাল্টে নতুন Lock Gate তৈরী করাহয়। তারপর ১৮৯৫ – ১৮৯৭ সাল অবধি ভাঙ্গর খাল তৈরী হয় (কিছুটা পুরাতন খাল ছিল আর বাকিটা খনন করা হয়) এবং বিদ্যাধরী নদীর উপর (বামনঘাটা এলাকায়) এবং কুল্টি নদীর উপর Lock Gate তৈরী করা হয়। এই সমস্ত কাজ ক্ষতিগ্রস্ত ক্রমাগত করে যাওয়ার ফলে বিদ্যাধরী নদীর মূল শাখা – Central Lake Channel – দ্রুত পলিমাটি জমে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদ্যাধরী নদীর উপর এই কারিগরি প্রয়োগের কালপঞ্জি আসন্ন তালিকায় দেওয়া হল।

বিদ্যাধরী নদীর ক্ষতিগ্রস্ত হবার আরও কিছু কারণ ছিল। এক সময় নোনা গাঙ, নোওয়াই আর সুঁতি নদী বিদ্যাধরীতে মিশত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা গতিপথ পালটে কুল্টি নদীতে গিয়ে মেশে। প্রকৃতির কোন অদ্ভুত এক খামখেয়ালিপনায় এই পরিবর্তন হয় এবং এর ফলে বিদ্যাধরী নদীতে নোনা জলের পরিমাণ আরও কমতে থাকে। এছাড়া, ১৮৩০ সাল এর কিছু আগে থেকে বিদ্যাধরীর বয়ে যাবার রাস্তায় বেশ কিছু নোনা ভেড়ি ছিল যাতে মাছ চাষ, বিশেষ করে চিংড়ি চাষ হত।জোয়ারের সময়েই ভেড়িগুলিতে নোনা জল ঢুকিয়ে নেওয়া হত এবং এটা চিংড়ি চাষের পক্ষে উপযুক্ত ছিল। একই সঙ্গে এই এলাকায় নদী বাঁধও ছিল।এই সব কারণে নদী তার বয়ে আনা পলিমাটি পাড়ে এবং চারিপাশে জমিয়ে ব-দ্বীপ সম্পূর্ণ করার কাজে ক্রমাগত বাধা পেত। এতে শুধু উর্বর মাটির ব-দ্বীপ সৃষ্টিই ব্যাহত হল না, জোয়ার ভাটা খেলার স্বাভাবিক ধর্ম পালন না করতে পেরে পলিমাটি জমে নদীর স্বাস্থ্যও প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। ১৯২৮ সালে সরকার ঘোষণা করলো যে বিদ্যাধরী নদীর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা কোনোভাবে সম্ভব নয়, সরকারের সেই রকম কোন ইচ্ছাও আর দেখা গেল না।

সারণি– ১ **বিদ্যাধরী নদীতে কৃত্রিম ভাবে খাল খনন ও তার কু-প্রভাবের কালপঞ্জি**

সাল	কারিগরি বিদ্যা প্রয়োগ করে করা কাজের নাম	ফলাফল	মন্তব্য

১৭৭৭	টলির নালা খনন	বিদ্যাধরীর অনেকটা জলসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	নদীর নীচের অংশে পলি জমে ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে।
১৭৯০	দুধবিবি খালে (বিদ্যাধরীর শাখা) বাঁধ দেওয়া হল – এলাকাটি তারদহের কাছে	নদী উত্তরের দিকে বয়ে যাবার পথ বাধাপ্রাপ্ত হল।	
১৮১০	বেলেঘাটা খাল কারিগরি বিদ্যা দিয়ে কিছু পরিবর্তন করে শিয়ালদহের কাছে Entally পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল।	নদীর স্বাভাবিক নিকাশীর রাস্তা বাধাপ্রাপ্ত হল।	
১৮৩০-৩৩	Circular Canal এবং চিৎপুর Lock Gate নির্মাণ।	বিদ্যাধরী বা Central Lake Channel এর বেলেঘাটার দিকের অংশ পলি পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল।	
১৮৫৯	উল্টোডাঙ্গা থেকে ধাপা পর্যন্তNew Cut Canal তৈরী হল।		পণ্যবাহী নৌকার চাপ কমানার জন্য করা হল।
১৮৬৫	পঞ্চান্নগ্রাম বাঁধ দেওয়া হল	স্বাভাবিকভাবে বিচরণে বাধাপ্রাপ্ত নদী তার স্বাভাবিক বিচরণ করা বন্ধ করে দিল।	নিকাশী সমস্যা দেখা দিল।
১৮৮৩	ধাপাতে এবং চিৎপুরে Lock Gate নির্মাণ – চিৎপুরে পুনর্নির্মাণ হল ।	Central Lake Channel ক্ষতিগ্রস্ত হল কারণ ধাপা থেকে Entally পর্যন্ত জলের গতিপথ বন্ধ হল।	১৯২৭ সালে ধাপা Lock Gate অকেজো করে দেওয়া হয়।

১৮৯৬	বিদ্যাধরীর শাখা কাটাতলা গাঙে আড়াআড়ি বাঁধ (Cross Dam)পড়ল	নদীর ভেতর পলিমাটি দ্রুত জমে গেল।	
১৮৯৫-১৮৯৭	পুরানো ভাঙ্গর খাল খনন করে বামনঘাটা থেকে কুল্টি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল।	নদীকে বয়ের নালা এলাকায় বন্ধ করে দেওয়া হল।	বাণিজ্যের সুবিধার্থে করা হল।
১৮৯৭	বামনঘাটা Lock Gate তৈরী হল।	Central Lake Channel বা বিদ্যাধরী নদী অতি দ্রুতগতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল।	ভাঙ্গর খালের নির্মাণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হল।
১৯১০	New Cut Canal এবং ভাঙ্গর খাল জুড়ে কৃষ্ণপুর খাল তৈরী হল।	বিদ্যাধরীর 78 km^2অববাহিকা এলাকা নষ্ট হয়ে গেল।	বিকল্প বাণিজ্য পথ তৈরী হল।

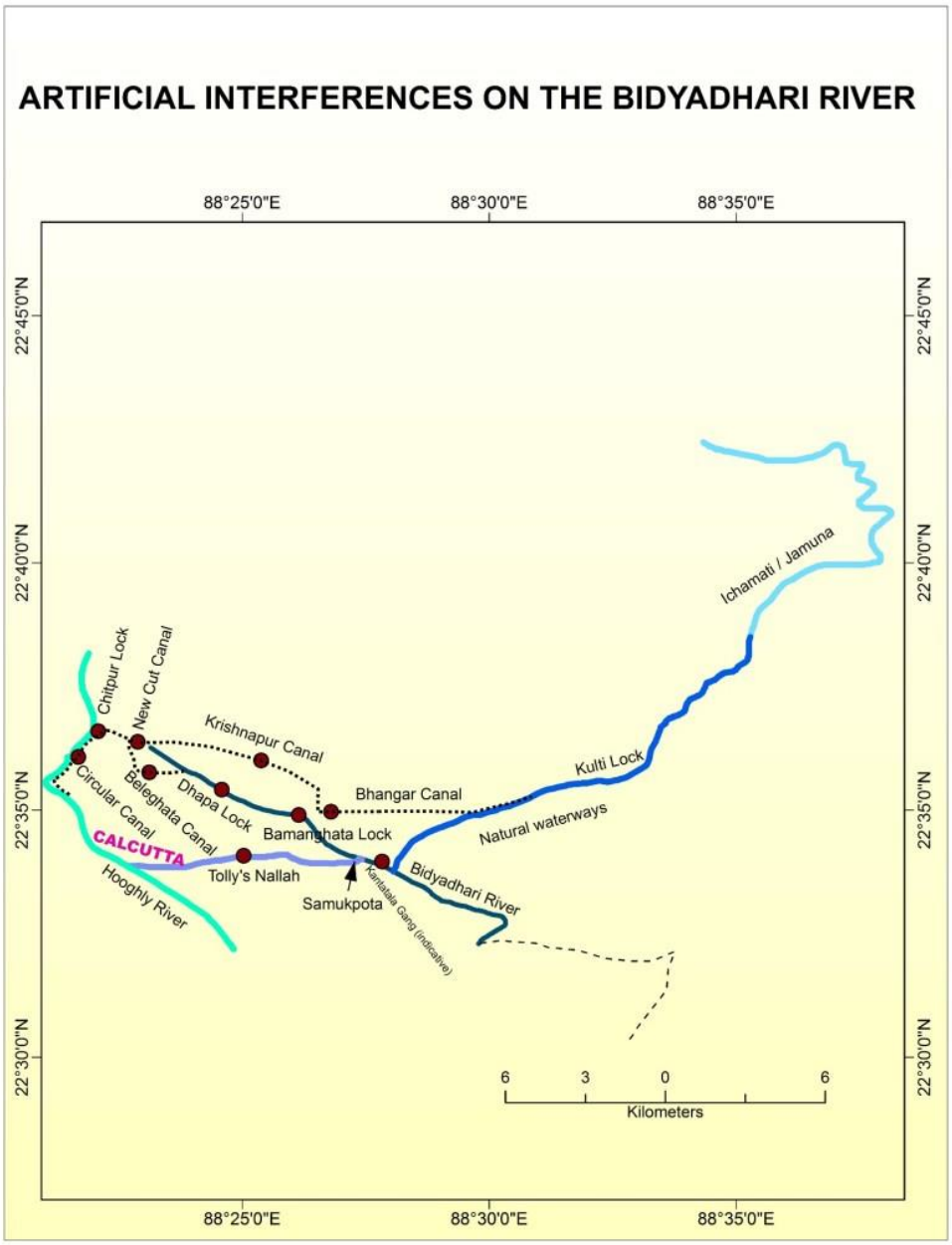

ম্যাপ ৪ – বিদ্যাধরী নদীর উপর কারিগরি

কলকাতা নিকাশী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল –

বিদ্যাধরী নদীর প্রধান অংশ Central Lake Channel কলকাতার তরল বর্জ্য বহন করে নিয়ে যেত এবং একই সঙ্গে বাণিজ্য পথ হিসেবেও কাজ করত। এই Central Lake Channel-এ কারিগরি বিদ্যার ক্রমাগত আক্রমণ কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল, উপরন্তু নদীর উপর অত্যধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে নদীরও প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। পুরোনো কলকাতার

বেহাল নিকাশী ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন Lord Wellesley (১৮০৩ সালে), ডাক্তার James Ranald Martin এবং সরকারের দ্বারা সংগঠিত Fever Hospital Committee। কলকাতা পুরসভার প্রথম ইঞ্জিনিয়ার William Clarke কলকাতার শহরের জন্য মাটির তলায় অবস্থিত একটি নিকাশী ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এইটিই আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। এটি প্রথম ১৮৫৫ সালে প্রস্তাবিত হয় এবং চুলচেরা বিচারের পরে ১৮৫৮ সালে গৃহীত হয়। নির্মাণ কার্য্য শেষ হয় ১৮৭৫ সালে। তরল বর্জ্য Central Lake Channel-এ গিয়ে পড়ত।

বিদ্যাধরী নদীর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে বেশ কিছু প্রশাসনিক জটিলতা ছিল। বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বঙ্গ সরকার তার Irrigation দপ্তরের মাধ্যমে নদী পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং তারই সঙ্গে রাজস্ব আদায় করত। এই দপ্তরই নিকাশী বয়ে নিয়ে যাওয়া নদীর স্বাস্থ্য বজায় রাখত এবং তার জন্য অর্থও ব্যয় করত। অপর দিকে কলকাতা পুরসভার কাজ ছিল পুর পরিষেবা হিসেবে নিকাশী নির্গমন ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনা করা। এই কাজের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তারাই করত, সেই ক্ষেত্রে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তাদের বহন করতে হত। কিন্তু প্রতিটি পরিকল্পনার জন্য তাদের সরকারের থেকে সম্মতি তথা অনুমোদন চাইতে হত, আবার সরকার অনেক সময় প্রকল্পের জন্য অর্থও দিতেন। এই গোলমেলে দায়িত্ব ভাগাভাগির জন্য ময়লা জলের নির্গমন ব্যবস্থা নিয়ে বিভ্রাট উপস্থিত হল।

কলকাতার নিকাশী নক্সা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল (ক) Town System (খ) Suburban System. Clarke এর নক্সা শুধু Town System কে মাথায় রেখে তৈরী করা হয়েছিল, আয়তন ছিল 21 Km^2। ময়লা জলের নালাগুলির জন্য যে নক্সা প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে তারা মাটির অন্তর্গত জল বা subsoil water, বাড়ীর থেকে নির্গত জল বা house drainage আর বৃষ্টির জল বা storm water শহরের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে। ২৪ ঘন্টায় ৬ ইঞ্চি বৃষ্টির জল গ্রহণ করা আর শুকনোর সময় প্রতিদিন ১০ মিলিয়ন গ্যালন ময়লা জল গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল এই ময়লা জলের নিকাশী ব্যবস্থার। নিকাশী খালের থেকে ময়লা জল গ্রহণ করতো Palmer's Bridge Pumping station. হঠাৎ ১৮৮১-৮২ সালে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী Circular Canal-এ ময়লা জল নিকাশীর অনুমতি বন্ধ করে দেওয়া হল এবং পুরসভাকে নিজের খরচে হালসিবাগান এলাকা থেকে pumping station অবধি একটি নতুন নিকাশী নালার নির্মাণ করতে হল। এই নালাটি সোজাসুজি একটি বড় নিকাশী খালে ময়লা জলের সম্পূর্ণটা ফেলে দিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে নানান কারণে নিকাশী খাল এবং তার পরিকাঠামোর উপর খুব চাপ পড়ে। এই কারণগুলি ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধি, পাকা রাস্তা তৈরী (যার জন্য ওই জায়গাগুলিতে মাটির উপরের জল নীচে আর যেত না) এবং শহরের ভেতরের অনেক জলাধার বন্ধ হয়ে যাবার ফলে বৃষ্টির জল শহরের রাস্তায় নিত্যদিন দাঁড়িয়ে যেত। তখন ১৮৯৬ সালে Kimber এবং Hughes নামে দু'জন ইঞ্জিনিয়ার, Baldwin Latham নামে আর একজন বিশ্ববিখ্যাত এবং অভিজ্ঞতা–সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার-এর সঙ্গে পরিকল্পনা করে নিকাশী ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারণ করে একটি নক্সা তৈরী করলেন। তৎকালীন সরকার এতে সম্মতি দেয় ১৯০০ সালে। এর কর্মসূচী রূপায়ন করতে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত লেগেছিল। এর তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

ক) দুটো উঁচু ময়লা জলের খাল Town এবং Suburban System থেকে, যথাক্রমে Palmer's Bridge এবং Ballygunge pumping station থেকে নিকাশী এবং বৃষ্টির জল গ্রহণ করে বিদ্যাধরী নদীতে ফেলে দেবে, এই ব্যবস্থা করা হল।

খ) Town এবং Suburban ব্যবস্থার সঙ্গে ময়লা জল ধরে রাখার আলাদা আলাদা জলাধার যুক্ত ছিল যার ক্ষমতা ছিল জোয়ারের ৮ ঘন্টা ময়লা জল ধরে রেখে ভাটার ৪ ঘন্টা সেই জলটাকে বের করে দেবার। নিম্নোক্ত ছবিতে এই কাজের নক্সা দেওয়া হল।

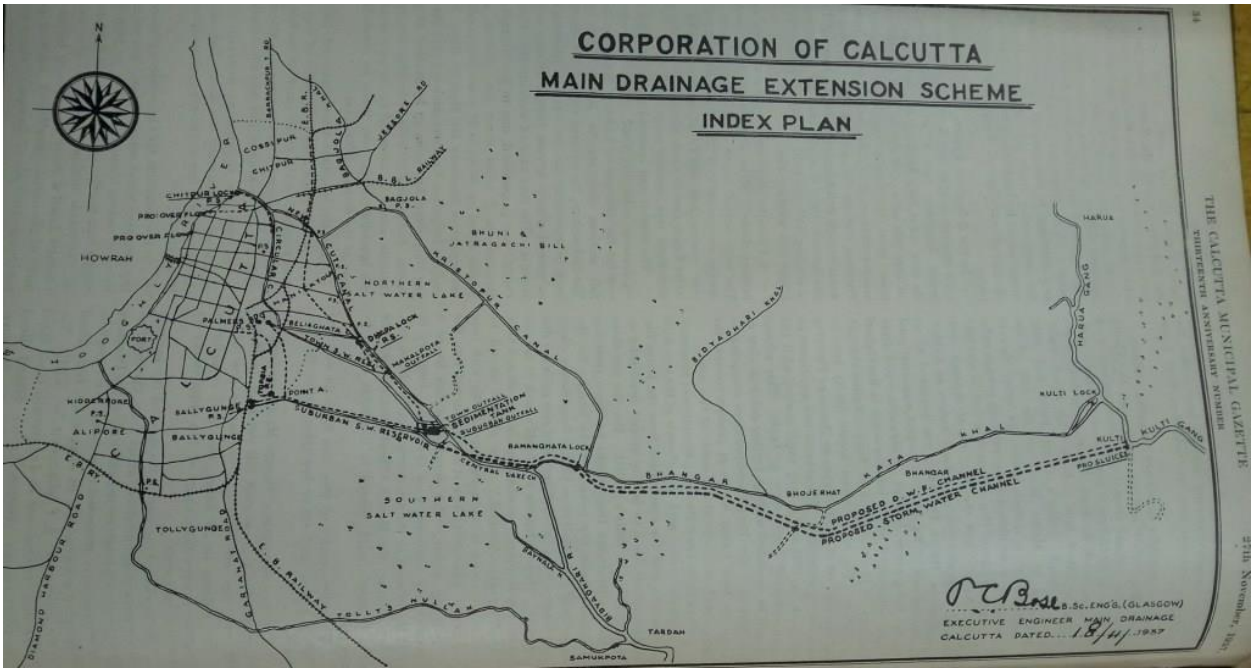

নিকাশী ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নক্সা, হস্তচিত্র

বিদ্যাধরী নদীর গুরুতর ক্ষতির চিহ্ন ১৯০২ সালে নদীর কারিগরি নক্সা বানাতে গিয়ে প্রথম Jacobs সাহেবের চোখে ধরা পড়ে। দুই বছর Irrigation দপ্তর এই খবর চেপে রাখার পর Chief Engineer D.B. Horn এই তথ্য প্রকাশ্যে আনেন। তখন পুরসভা নিকাশী ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য ২৯,৪৩,০০০ টাকা লগ্নি করার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল, অথচ তারা এই গুরুতর ক্ষতির খবর পেয়েও বিন্দুমাত্র সাবধান হয়নি। কারণ হিসেবে হয়ত Horn এর রিপোর্টের একটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে 'Although deterioration of the Lake Channel will continue, it is more than probable, that it will remain sufficiently large to carry away sewage.' অর্থাৎ নদী ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকলেও তার ময়লা জল বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থেকে যাবে।

১৯১৩ সালে পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার O.C. Lees এবং C. Addams Williams স্পষ্ট ভাষায় সরকার এবং পুরসভাকে সাবধানবাণী জানান যে আগামী ৬ বছরের মধ্যেই নদীর ময়লা জল বহন করার ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। ১৯১৪ সালে Addams Williams নদীর অববাহিকা এলাকার সম্প্রসারণ করবার পরিকল্পনা সরকারকে জমা দেন। সরকার ৩ বছরের জন্য কোন গুরুত্বই না দিয়ে পরিকল্পনাটি ফেলে রাখে এবং তারপরেও আংশিক কাজই করা হয়।

নদীর ক্ষতি প্রথমবার ধরা পড়ে ১৯০২ সালে এবং ক্ষতি রোধ করার চেষ্টা হয় ১৫ বছর বাদে, ১৯১৭-১৮ সালে – এই অত্যধিক লম্বা সময়ে নদী সমস্ত সংশোধনের সীমা অতিক্রম করে এবং Salt Lake এলাকা থেকে সরে যায়। কোন প্রকৃতি-বান্ধব উপায়ে তাকে ফিরিয়ে আনা যায়নি।

যে সংশোধন প্রক্রিয়া ১৯১৮ সালে শুরু হয় তা ৬ বছর ধরে চলে এবং ২০ লক্ষ টাকা খরচ হয়, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়। ১৯২৭ সালে ধাপা Lock Gate নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় এবং ১৯২৮ সালে বঙ্গ সরকার কলকাতা পুরসভার Chief Executive Officer-কে জানিয়ে দেন যে এই জলপথে বাণিজ্য কমে গিয়েছে। সরকার আরও জানায় যে তারা এই বিষয়ে আর কোন দৃষ্টিপাত করবে না – প্রকারান্তরে বলা যে বাণিজ্য বহাল রাখা ছাড়া তাদের আর কোন বিষয়ে আগ্রহ অবশিষ্ট নেই। পুরসভার কাছে নদীর পরিচর্যা এবং সংরক্ষণের জন্য কোন প্রয়োজনীয় তথ্য ছিল না, সেটা বরাবর Irrigation দপ্তর দেখাশুনা করত। এই দপ্তর কেবল বাণিজ্য এবং রোজগারে আগ্রহী ছিল, তাই নদীর ক্ষতি নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। নিজেদের তথ্য থাকলে হয়ত পুরসভা পূর্ব দিনের কিছু কিছু কার্যকলাপে বাধা দিত।

একটি মৃতপ্রায় নদীর নিকাশীর নির্গমন পথ পরিবর্তন –

১৯২৬ সালে কলকাতার পানীয় জল সরবরাহ দ্বিগুণ করা হয় কিন্তু নিকাশী সমস্যার কোন সমাধান না হওয়ায় ময়লা জলের নির্গমন পথের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে থাকে। সমস্যার সমাধানের জন্য বিদ্যাধরী কমিটি গঠন করা হয়, সেখানে প্রয়োজনীয় সব দপ্তরের প্রতিনিধিরাই ছিলেন। সকলে মিলে ঠিক করলেন যে ১,৭১,০০,০০০ টাকা খরচা করলে একটা নতুন স্থায়ী পরিকল্পনা বানানো যাবে। তাতে নতুন করে মাটির নীচে আরও বেশী এলাকা জুড়ে ময়লা জলের জলপথ বানাতে হবে, তৎকালীন দুটি pumping station তুলে দিয়ে একটি নতুন pumping station তৈরীর কাজ করতে হবে তোপসিয়ায়। কলকাতার পুরো ময়লা জল এবং বৃষ্টির জল একটি জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখান থেকে পাম্প করে জোয়ার – ভাটা নির্বিশেষে বিদ্যাধরীতে নির্গমন হবে। পুরসভা এটি মেনে নিলেও নিজেদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাসীমিত হবার জন্য প্রকল্পটি রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিদ্যাধরী নদীর অবস্থা খুবই খারাপ হওয়াতে নদীকে আরও বেশী করে ব্যবহার করা সম্ভব ছিলনা।

এই বিপদগ্রস্ত অবস্থায় ১৯২৯ সালে ইঞ্জিনিয়ারদের শীর্ষস্থান Glasgow শহর থেকে কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বিদেশে কর্মরত মেধাবী বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার ড. বীরেন্দ্রনাথ দে'কে বিদেশ থেকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি অনেক অনুরোধের পরে ফিরে এসেছিলেন এবং Special Officer Drainage হয়েছিলেন। ওনার দায়িত্ব ছিল কলকাতার এই ময়লা জল নির্গমনের পথ খুঁজে বার করা (Outfall Scheme) এবং একই সঙ্গে শহরের ভেতরের নিকাশী ব্যবস্থারও উন্নতি করা (Internal Drainage Scheme)। ওনার নিযুক্তির ছয় মাসের মধ্যে উনি Internal Drainage Scheme ৬৫ লক্ষ টাকার মধ্যে তৈরী করা যাবে বলে প্রস্তাব করেন এবং কুল্টি নদীর সঙ্গে যুক্ত Outfall Scheme ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে বলে প্রস্তাব দেন। Internal Drainage Scheme-এ চালু pumping station এর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হল এবং তপসিয়া ও ধাপাতে দুটি নতুন pumping station বসানোর ব্যবস্থা করা হল। নিকাশী খাল, জলাধার এবং আনুষঙ্গিক ময়লা জলের শাখা খাল এবং উপর্যুপরি পরিকাঠামো আরও বিস্তার করা হল, এবং বর্ষার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ খাল দিয়ে নিকাশীর নির্গমনের ব্যবস্থা করা হল।

ঠিক হল যে শহরের নিকাশী এক জোড়া খালের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব দিকদিয়ে বয়ে যাবে,এটা গিয়ে মিশবে এমন নদীতে যাতে জোয়ার-ভাটা খেলে এবং যেটি রায়মঙ্গল নদীর মোহনার সঙ্গে যুক্ত। এই খাল দুটির নাম হবে Dry Weather Flow (DWF) এবং Storm Weather Flow (SWF)-এরা Kulti নদীতে গিয়ে মিশবে। DWF খালে cement এর প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল, যাতে যত তাড়াতাড়ি যত বেশী সম্ভব জল বহন করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্হা থাকে।

Dr. B.N. Dey হুগলী নদীকে নিকাশী গ্রহণ করার নদী হিসেবে দুটি কারণে ব্যবহার করতে চাননি। সেগুলি হল (ক) অত্যন্ত জনবহুল এই নদীর ধারে কাজের জন্য জমি পেতে বিপুল অর্থব্যয় হত (খ) হুগলী যেহেতু পানীয় জলের নদী ছিল, ময়লা জল পরিশোধনের সঠিক ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত নদীতে নিকাশী ফেলা যেতনা এবং শহরের বিপদ অনেক বেশী বেড়ে যেত (Chicago শহরে এই কাজটি করতে ৮ বছর সময় লেগেছিল)। ১৯৪৫ সালে নিকাশী সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কমিটি তৈরী হয়। এই কমিটির নাম ছিল Committee to Enquire into the Drainage Condition of Calcutta and Adjoining Areas. এদের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে Dr. Dey বলেন হুগলী নদীর জল খুব সীমিতভাবেই নিকাশীর সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত – জোয়ারের সময় নিকাশী খাল পরিষ্কার করা এবং ভাটার সময় অতিবৃষ্টির জল বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া, এই উঁচু-স্তরে অবস্থিত হুগলী নদীকে কখনই নিকাশী নদী বা ময়লা জলের নদী হিসাবে ব্যবহার হওয়া উচিত নয়।

Dr. Dey ১৯৩০ সালে সরকারকে তার Outfall Scheme বা ময়লা জল নির্গমনের পরিকল্পনা জমা দেন কিন্তু তা গৃহীত হয়নি, বলা হয়েছিল যে ময়লা জল নদীতে ফেলার আগে জমে থাকা কঠিন বর্জ্য বা solid waste কে আলাদা করে tank তৈরী করে যতদূর সম্ভব ময়লা জলের থেকে আলাদা করে দিতে হবে। এই পদ্ধতি তখন England এ চালু ছিল। সরকারের নির্বাচিত ইংরেজ বিশেষজ্ঞদের দেওয়া বিকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিদ্যাধরী নদীকে অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত করা যেত। আশ্চর্যভাবে, সরকারের নিজের ইঞ্জিনিয়ার Addams Williams অনেক আগেই বলেছিলেন যে এই শহর অচিরেই নিজের ময়লা জলে নিজেই ডুবে যাবে কিন্তু সরকার বা তার বিশেষজ্ঞরা, যারা Addams Williams এর পরে এসেছিলেন, তারা কিছুতেই এই কথা বিশ্বাস করতে চান নি। তারা অনেক সময় ধরে কোন সম্মতি দেন নি। ইতিমধ্যে Dr. Dey পুরসভার প্রথম বাঙালী Chief Engineer হয়ে যান, আর দুই সহযোগী হন Executive Engineer (Drainage) P.C. Bose এবং নদী জরিপের কাজে নিযুক্ত Outfall Engineer A. N. Banerjee। সরকারের চাহিদা মত নদীতে আগে নিকাশী ময়লা জলে উপস্থিত কঠিন বর্জ্য বের করে দেবার জন্য Sedimentation Tank এবং Lagoon অর্থাৎ ময়লা জল থিতিয়ে যাবার আধার এবং অন্যান্য কিছু ব্যবস্থা সহ এনারা নতুন পরিকল্পনা এবং নক্সা জমা দেন। এই ব্যবস্থাগুলি শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে বানতলায় করা হবে বলে স্থির হয়। এর জন্য খরচ বাবদ ৪৮ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। সরকার ১৯৩৫ সালে এই প্রস্তাব অনুমোদন করে দেয়।

নিকাশী এবং ময়লা জল সামলানো –

সরকার যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তার দুটি অংশ ছিল; দুটি ময়লা জল নির্গমনের খাল তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল, তারই সঙ্গে ছিল কঠিন বর্জ্য খালে এবং নদীতে যাতে না যেতে পারে তার জন্য আলাদা করে tank এর দ্বারা কঠিন বর্জ্য ধরে রাখা এবং পরবর্তী কালে tank পরিষ্কার করে দেওয়ার পরিকল্পনা। Dry Weather Flow বা DWF খালটির বহন ক্ষমতা ছিল ৭০০ কিউসেকের কাছাকাছি (about 700 cusecs) অথবা $57 m^3/s$.বর্ষার সময় অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়া ছিল শহরের মূল সমস্যা। SWF খালের ভিত ছিল 45.72m চওড়া (বা 150 ফুট)। DWF খালের ভিত ছিল 4.87m চওড়া (বা 16 ফুট)। দুটি খালের ঢালের আনুপাতিক সংখ্যা বা ratio ছিল 1.5:1. SWF খালটি কলকাতা শহরের জন্য তৈরী হলেও তার ১৭ মাইল (17 miles বা 28 km) যাত্রাপথে এটি একটি বিশাল গ্রামীণ এলাকার মধ্যে দিয়ে যায় এবং $331.5 km^2$বা ১২৮ স্কোয়ার মাইল এলাকার নিকাশী সমস্যার সমাধান করে দেয়। SWF খাল DWF খালের দক্ষিণে ছিল, এবং শেষ অংশে পৌঁছে কোনো পাম্পের ব্যবহার ছাড়াই জমির ঢালের সহায়তায় এবং প্রাকৃতিক উপায়ে শহরের নিকাশী যথাসময়ে পরিশ্রুত হয়ে কুল্টি নদীতে পড়ত। যেখানে এটি সম্পন্ন হত, এবং আজও হয়, সেই জায়গাটির নাম ঘুষিঘাটা।

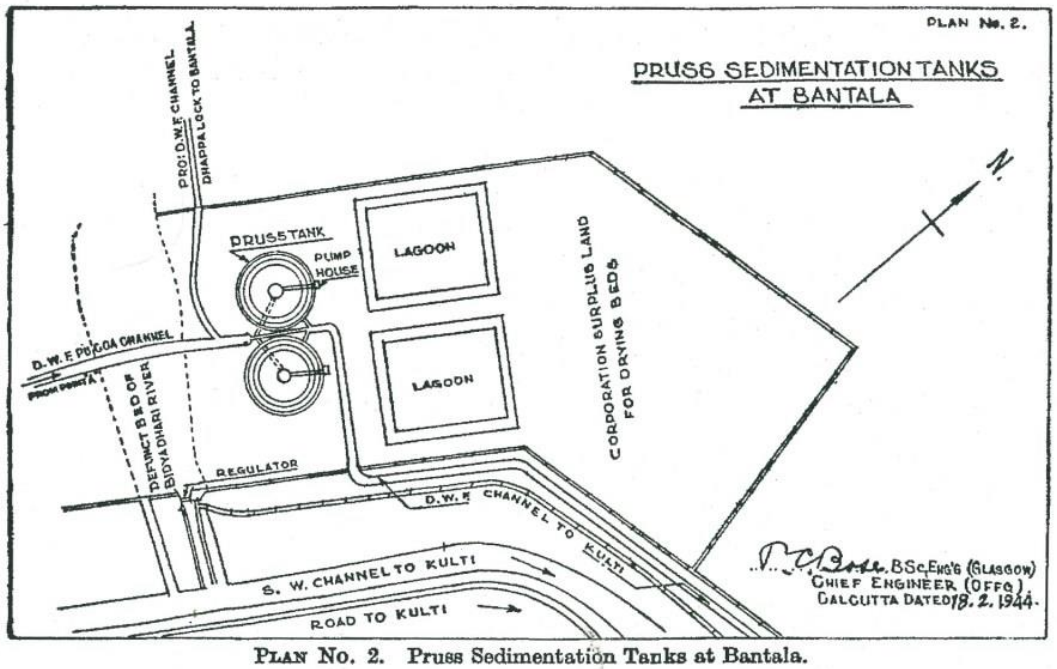

Plan No. 2. Pruss Sedimentation Tanks at Bantala.

Dr. B.N. Dey পরিকল্পিত নতুন নিকাশি ব্যবস্থা, হস্তচিত্র

SWF এবং DWF খাল ঘুষিঘাটায় নিয়ন্ত্রিত হয় Sluice Gate এর মাধ্যমে। কুল্টি নদীতে জোয়ার ভাটার সময় অনুযায়ী এই Sluice Gate গুলি জল আটকে রাখে অথবা ছেড়ে দেয়। প্রথমে SWF খালের উপর ১৬টি sluice gate এবং DWF খালের উপর ৫টি Sluice Gate করা হয়। এই কাজ ১৯৪০ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

এই নতুন নিকাশী ব্যবস্থার কাজ চলাকালীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং মাল-মশলার তীব্র সংকট দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও sedimentation tank নির্মিত হয়ে যায় এবং ১৯৪৫ সাল থেকে এই tank দুটি কাজ চালু করে দেয়। কঠিন বর্জ্য বা solid waste খালে পৌঁছবার আগে এখানে থিতিয়ে যেত। যুদ্ধের সময় আকাশ থেকে বোমা পড়ার প্রবল আশঙ্কা ছিল। তাই এই নিকাশী ব্যবস্থার কাজ করবার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল, এবং খুব কষ্ট করে হলেও কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়। তবে DWF-এর দ্বিতীয় অংশের কাজ ১৯৪৫-এ শেষ করা যায়নি।

বিদ্যাধরীর বহন-ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবার ফলে এত সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হয়েছিল যে SWF খাল অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থাতেই চালু করতে হয়েছিল।

কলকাতা পুরসভার একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১৯২৩ সালে চালু হয়েছিল যার নাম Calcutta Municipal Gazette. এটি সুভাষচন্দ্র বসু চালু করেছিলেন এবং বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে যুক্ত নিকাশী সঙ্কটের কাহিনী বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এইখানে লিখতে গিয়ে Outfall Engineer A.N Banerjee ১৯৪১ সালে বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন স্থানীয় জমিদারেরা বুঝতে পেরেছেন যে তারা অল্প কিছু পয়সার বিনিময়ে তাদের সুবিধাগুলি ভবিষ্যতে ধরে রাখতে পারবেন। তাদের দেয় অর্থ দিয়ে পুরসভার খাল পরিচর্যার কাজ করবে এবং বেশ কিছু জমিদার এই অর্থ দিতে রাজি হয়ে পুরসভার কাছে প্রস্তাব রেখেছেন।

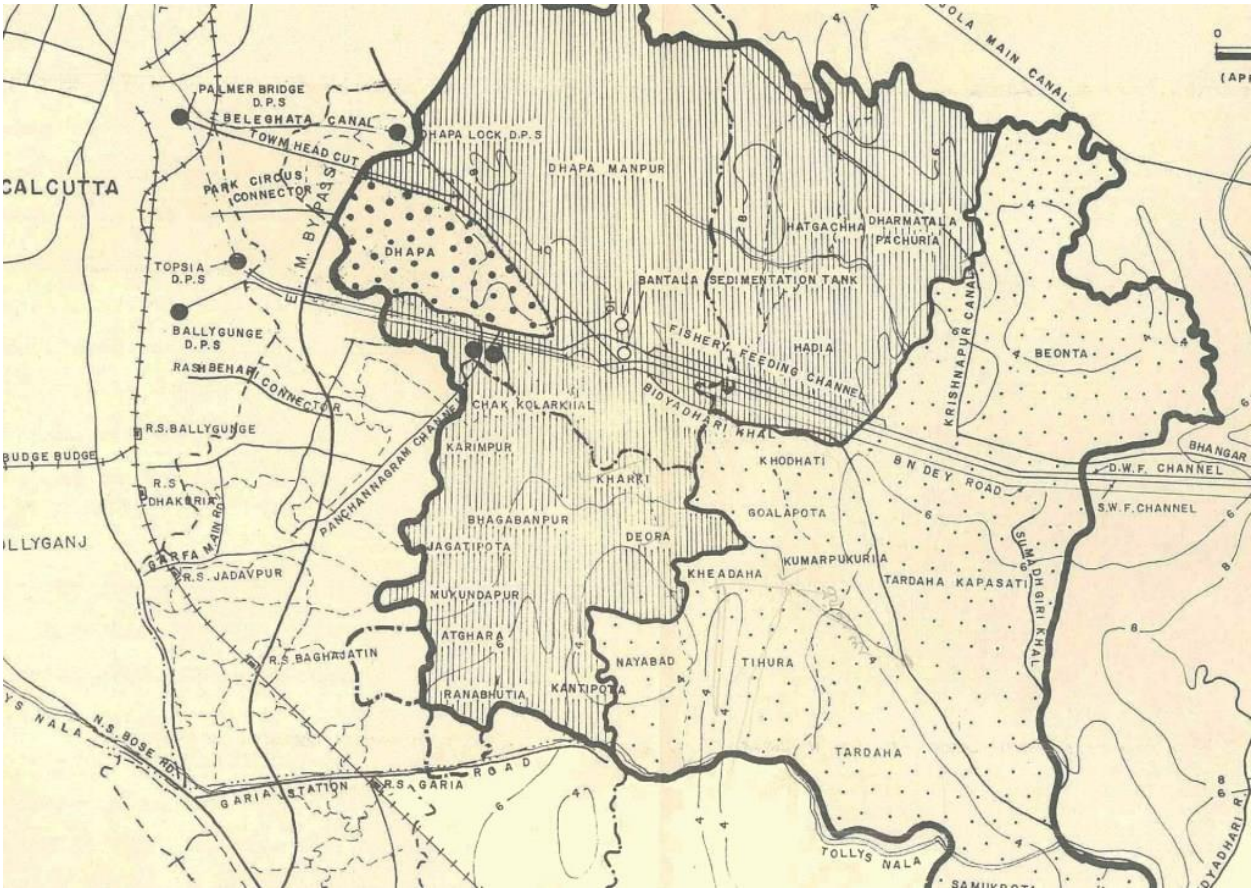

জলাভূমির প্রথম ম্যাপ

ময়লা জল এবং তার পরিশোধন– পূর্ব কলকাতার জলাভূমির আবির্ভাব

সরকারি Irrigation Engineer এবং পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বিদ্যাধরী নদীতে অপরিশ্রুত ময়লা জল ফেলার ব্যাপারে তীব্র মতপার্থক্য ছিল। প্রথম দল সবসময় দাবি করত যে ময়লা জল ফেলার জন্যই বিদ্যাধরী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় দল দাবি করত যে Sanitary Commissioner of Bengal এর রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতার ময়লা জল খুব বেশি পরিমাণে ক্ষতিকারক ছিল না, কারণ এটা মানুষের বাড়ি থেকে নির্গত হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে Chief Engineer হিসেবে পুরসভায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন P.C. Bose, যিনি আগে Dr. B.N. Deyর executive engineer ছিলেন। ইনি ময়লা জলের চরিত্র বিশ্লেষণ করার দায়িত্বে ছিলেন এবং নিজের গবেষণাগারে (Laboratory) অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন। গৃহস্থের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ময়লা জলের গুণগত চরিত্র নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং তৎকালীন

বিজ্ঞানীদের লেখা পড়েছিলেন। উনি বলেছিলেন যে নদী নালা খাল ইত্যাদি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য একটা দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ঠিক করে দেওয়া উচিত এবং এটি বজায় রাখা উচিত।

১৯২৮ সালে যখন বিদ্যাধরী নদী তার নোনা জলের সরবরাহ হারিয়ে ফেলল, তখন স্থানীয় একজন জমিদার ১৯৩০ সাল থেকে অল্প অল্প করে ময়লা জল ব্যবহার করেমাছ চাষ শুরু করে। তার চেষ্টার ফল খুব ভাল হয় এবং ক্রমে ক্রমে একটা বড় এলাকা জুড়ে মাছ চাষ শুরু হয়। কিন্তু এলাকায় নিকাশীর সমস্যা ছিল বলে মাছ উৎপাদনের ক্ষতি হত। SWF খাল বেশ নীচু করে তৈরী হবার ফলে নিকাশী সমস্যার যথোপযুক্ত সমাধান হল। DWF খালের মাধ্যমে সারা বছর মাছের ভেড়িকে ময়লা জলের যোগান দেওয়া হবে–এই পরিকল্পনা করেই তৈরী হয়েছিল। গরম কালে বিশেষ করে এই ময়লা জলের চাহিদা থাকত, তবে শুধু DWF এর উত্তর ভাগের ভেড়িগুলিই সুবিধা পেত। এরপরে বানতলাতে ময়লা জল নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০ টি জল নিয়ন্ত্রক Lock Gate তৈরী হল, একটি ৮ কিমি লম্বা শাখা খাল তৈরি করা হয়েছিল যা থেকে উপশাখা দিয়ে বিভিন্ন ভেড়িতে ময়লা জল যেত। জল যাতে DWF-এর দক্ষিণ ভাগেও পৌঁছোয়, তার জন্যে লালকুঠি এলাকায় ১৯৬০ সালে একটি Siphon এর ব্যবস্থা করা হয়, তাতে DWF-এর জল দক্ষিণ ভাগের মানুষের মাছ চাষের জন্য যোগান দেওয়া হল।

যে পরিকল্পনার দ্বারা সারা বছর ময়লা জলের যোগানের ব্যবস্থা হল, তাতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ময়লা জলে মাছ চাষ এবং অন্যান্য চাষ ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলেই তৈরী হল পূর্ব কলকাতার জলাভূমি।

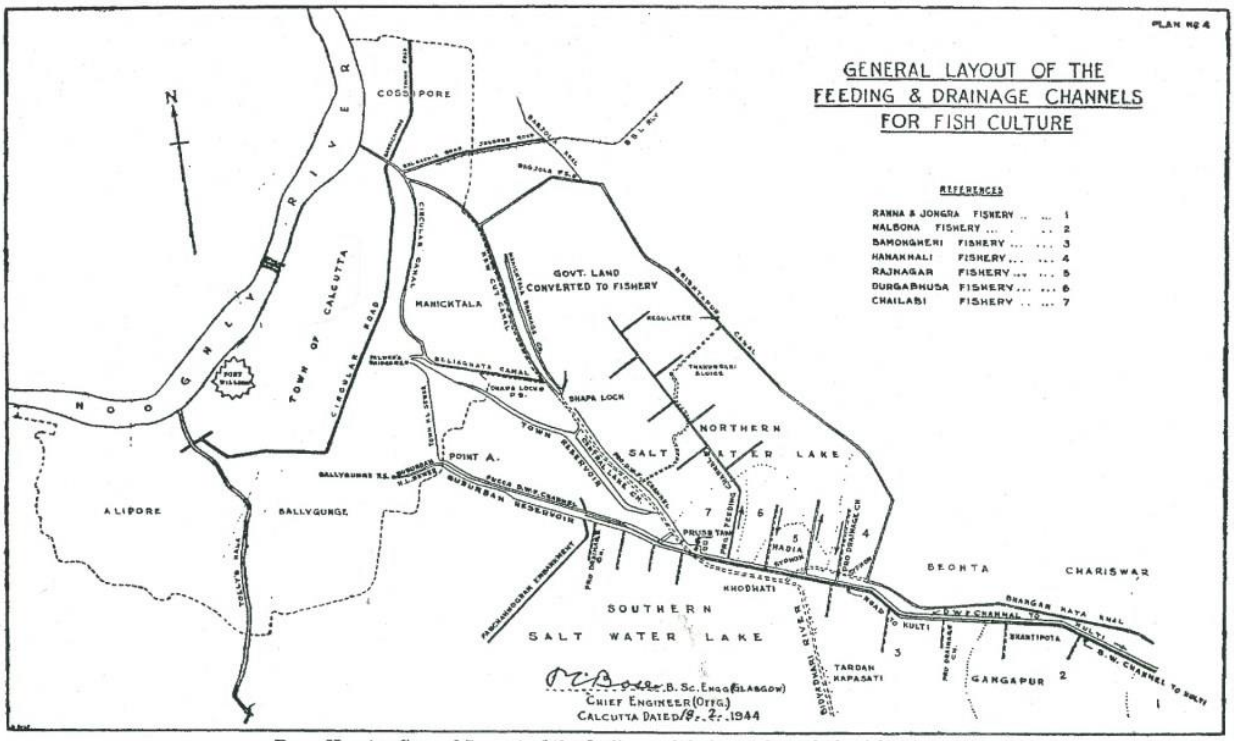

PLAN No. 4. General Layout of the feeding and drainage channels for fish culture.

মাছের ভেড়ির বিস্তারিত ছবি

সারণি ২ – কারিগরি বিদ্যার দ্বারা খাদ্য উৎপাদন তথা ময়লা জল পরিশোধনের জন্য পূর্ব কলকাতার জলাভূমির বিবর্তন।

কাজের বর্ণনা	সাল	পরিণাম	মন্তব্য
SWF খাল তৈরী শেষ হল	১৯৩৯	মাছের ভেড়িরা ময়লা জলের যোগান এবং নিকাশী ব্যবস্থা দুই-ই পেল।	এই খাল দিয়ে বর্ষাকালের বাড়তি জল যেত এবং ঘুষিঘাটায় গিয়ে ১৬ কপাটের গেট (sluice gate) দিয়ে জল কুল্টি (Kulti) নদীতে গিয়ে পড়ত। ১৯৬৫ সাল অবধি বামনঘাটা থেকে ভাঙ্গড়

			(ঘুষিঘাটার কাছে) অবধি নৌকা চলত।
DWF খাল দুই ভাগে সম্পূর্ণ হল।	১৯৩৬-১৯৪৫, প্রথম ভাগ ১৯৪৭-১৯৫৩, দ্বিতীয় ভাগ	ভেড়ির মালিকেরা ময়লা জল পেতে আরম্ভ করে। ময়লা জলের বিতরণ আরও ছড়িয়ে দেবার জন্য ব্যবস্থা করা হল।	ঘুষিঘাটায় ৫ কপাটের গেট (sluice gate) তৈরী হল। ৯ থেকে ১৭ মাইল পর্য্যন্ত খাল খননের কাজ হল, কপাটের সংখ্যা ৫ থেকে ২০ অবধি বেড়ে গেল।
বানতলা জল নিয়ন্ত্রক গেট তৈরী হল	১৯৪৫-১৯৪৬	DWF এর উত্তর ভগের মাছের ভেড়িরা বেশী জলের যোগান পেল।	শহরে Town অংশ থেকে যে নিকাশী খাল বানতলায় এসেছিল, তার উপর এই Sluice Gate তৈরী হল।
Fishery Feeding Channel বা ফিসারী ফিডিং খাল	১৯৪৭ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে নির্মিত	বানতলা Sluice Gate থেকে কারিগরি কৌশলে ৮ কিমি (8 km) দূর পর্যন্ত ময়লা জল পৌঁছে দেওয়া গেল।	শাখা খাল যার থেকে অনেক উপ-শাখা খাল বেরিয়েছে, বহন ক্ষমতা $12.74 m^3/s$ বা ৪৫০ কিউসেক (450 Cusecs) – বানতলা থেকে কড়াইডাঙ্গা এলাকা পর্যন্ত যায়।
লালকুঠী Siphon	১৯৬০	এই এলাকার দক্ষিণ অংশে মাছ এবং ধান উৎপাদন বেড়ে গেল	Siphon এর ৩টে মুখ আছে, প্রতিটি ১২০০ মি.মি চওড়া।
কয়েকটি *siphon* যার মাধ্যমে কিছু ভেড়ি	১৯৪৭-১৯৫০ এর মধ্যে	উত্তর দিকের মাছের ভেড়ির মালিকরা উপকৃত হল।	পরাণ চাপরাসী খাল এবং নাওভাঙ্গা খাল Town

Town অংশের নিকাশী খালের সঙ্গে জুড়ে যায়।			অংশের নিকাশী খালের সঙ্গে যুক্ত হল।
ধাপা লক (Dhapa Lock) pumping station নির্মাণ	বিল্ডিং ১৯৪১ সালে হয়, pumping station ১৯৫৮ সালে হয়।	গ্রীষ্মের সময়ের ময়লা জল Town অংশের নিকাশী বড় খালে পৌঁছে দেবার জন্য নতুন Feeder/সংযোজক খাল তৈরী করতে হয়।	মানিকতলা pumping station থেকে ময়লা জল এই নতুন নির্মিত station-এ আসে – মানিকতলা station-এ Town অংশের কিছু নতুন নিকাশী এলাকা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।
তোপসিয়া pumping station নির্মাণ	১৯৭২	Palmer's Bridge এবং বালিগঞ্জ pumping station-এর একটি অংশের ময়লা জল DWF খালে এসে মেশে, আরও পাওয়া যায় তোপসিয়া এলাকার নিকাশী ময়লা জল।	শহরের Suburban অংশের বেড়ে যাওয়া জায়গাগুলির নিকাশী এখানে আসে। এই এলাকায় কিছু পূর্ব অবস্থিত পুকুর বুজিয়ে ফেলা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য – শহরের Town অংশের মূল নিকাশী বহন নালা এবং Suburban অংশেরনিকাশী বহন নালা বানতলায় পৌঁছে যাবার পরে মিশে যায় এবং SWF খাল চালু হয়।

১৯৪৪ সালে কলকাতায় একটি আলোচনাসভা হয় যাতে মৎস্য চাষে শহরের বাসিন্দাদের বাড়ির ময়লা জল ব্যবহার বিষয়ক কথাবার্তা হয়। কলকাতা পুরসভা এবং মৎস্য দপ্তর এতে অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে সারাদেশে প্রবল খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং একটি স্লোগান চালু হয় Grow More Food, আরও খাদ্য উৎপাদন কর। এই সময়ে অল্প দামে পুষ্টিকর খাবার হিসেবে মাছের চাহিদা খুবই বেড়ে যায়। তৎকালীন মৎস্য অধিকর্তা ডঃ সুন্দর লাল হোরা বলেন যে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ময়লা জল ব্যবহার করে মাছ উৎপাদন করলে সবচেয়ে উপযুক্তভাবে ময়লা জল পরিশোধনের কাজ সম্পন্ন হবে।

এই কথাটাই এই এলাকার মাছ চাষীরা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের জীবন দর্শন হিসেবে। এই বানতলা থেকে কড়াইডাঙ্গা পর্যন্ত নির্মিত Fishery Feeding Channel অনেক মাছের ভেড়িতে ময়লা জল যোগান দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। বিদ্যাধরী এই এলাকা থেকে চলে গেলেও তার শাখা উপশাখা এবং পরে সরকারের দ্বারা নির্মিত তথা ব্যক্তি মালিকদের কিছু নির্মিত খাল বা প্রশাখা খাল–সব একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পুরসভার ময়লা জলের খালের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে এদের চাষের এলাকা বেড়ে গেল এবং পরে মাছ চাষের সঙ্গে সঙ্গে সব্জী এবং ধান চাষেরও বৃদ্ধি হল। এই এলাকার ভৌগলিক চেহারা নিম্নোক্ত ছবিতে দেওয়া আছে। ১৯৬৬ সালে পুরসভা এই নিকাশী দায়িত্ব irrigation দপ্তরকে দিয়ে দেয় তখন কঠিন বর্জ্য আটকে দেবার tank গুলিতে আর তেমন কাজ হচ্ছিল না। কিন্তু ময়লা জল থিতানোর কাজ ভেড়িগুলিই করছিল।

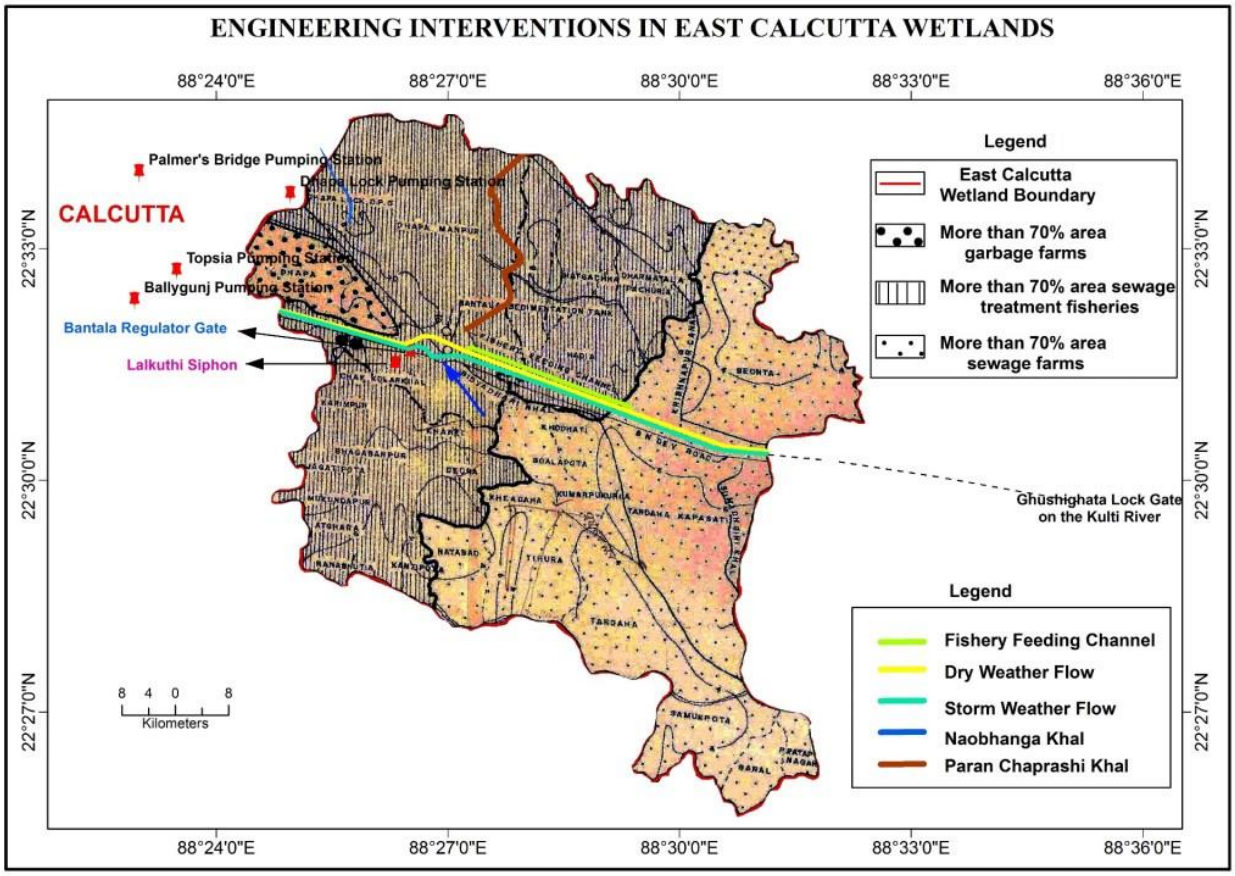

কারিগরি নির্মাণ এবং পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ভৌগলিক চিত্র

বিস্মৃতি ও পরিবর্তন –

১৯৬৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) Engineering Consortium নামে আমেরিকার কারিগরি-বিদ্যার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কে কলকাতা পাঠায়। তারা এখানে এসেছিল নগর পরিষেবার ব্যবস্থা (পানীয় জল, নিকাশী এবং ময়লা জল) আরও উন্নত করতে, জলবাহী রোগ যাতে সম্পূর্ণ কমে যায়। ময়লা জল পরিশোধনকে এঁরা কোন গুরুত্বই দেয়নি। তারা বলে যে বানতলায় অবস্থিত জল পরিশোধন ব্যবস্থা বাঁচিয়ে তোলার কোন প্রয়োজন নেই। সেই সময় হুগলী নদীর জল সুপেয় ছিল। তাঁরা DWF-কেও গুরুত্ব দেননি, শুধু SWF এর পরিচর্যা করবার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে শহরবাসী মনে রাখেনি, তাই কেউই সঠিকভাবে Engineering Consortium-কে এই জলাভূমির গুরুত্বের কথা জানাননি, কারণ তারা নিজেরাই জানতেন না। বরং ভারত সরকারের আয়ত্তাধীন গঙ্গাকে পরিশ্রুত করার পরিকল্পনা Ganga Action Plan পূর্ব কলকাতার জলাভূমির পরিশোধনের এই ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছিল। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গার উপর অবস্থিত সমস্ত শহর যারা নদীতে ময়লা জল অপরিশুদ্ধ অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে, তাদের ময়লা জল পরিশোধনের বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান খুঁজতে সাহায্য করা।

এই জলাভূমির মুখ্য প্রবক্তা ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ যখন ১৯৮০ র দশকে প্রথম এই জায়গায় আসেন, তিনি বুঝেছিলেন যে এই জলাভূমি হল অগভীর পুকুর যা DWF থেকে ময়লা জল পায় এবং সেই জল পরিশোধন করে। এতে শহরের কৃত্রিম ব্যয়বহুল উপায়ে ময়লা জল পরিশোধনের খরচ বাঁচে। Ganga Action Plan এর প্রকল্পে কলকাতার জন্য যখন কম খরচের ময়লা জল পরিশোধনের ব্যবস্থা অনুসন্ধান করার নির্দেশ এসেছিল তখন, তিনি কঠোর পরিশ্রম করে জাতীয় পরিবেশ মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই জলাভূমিকে প্রকৃতি–বান্ধব উপায়ে কম খরচে ময়লা জলের পরিশোধন-ব্যবস্থা অর্থাৎ low cost sanitation option for wastewater treatment হিসাবে স্বীকৃতি নিয়ে এসেছিলেন।

ময়লা জলের যথেষ্ট জোগান পেয়ে সময়ের সাথে সাথে এখানকার চাষীরা এই জলটাকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে মাছ, সব্জী এবং ধান চাষ করার সুসংগতিপূর্ণ উপায় বার করে ফেলে। তারা ময়লা জলকে পোষক হিসেবে দেখতে শেখে, দূষক হিসেবে নয়। তথাকথিত পুঁথিবিদ্যায় পারদর্শী না হওয়ার জন্যই তারা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে নিজেদের জীবনদর্শন পরিপুষ্ট করেছিল এবং পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিল। এই সাধারণ জ্ঞানের গুণপনার থেকে আমাদের শিক্ষিত সমাজের অনেক কিছু শেখার আছে।

একই সঙ্গে ময়লা জল ও যত্ন করে পরিশোধিত হল। ময়লা জল মাছের পুকুরে (একে ভেড়িও বলা হয়) একটা নির্দিষ্ট পরিমাপে প্রবেশ করানো হয় এবং ২১ দিন পুকুরে থিতোনোর সময় দিতে হয়। পুকুরে Algae বা শ্যাওলা থাকে, আর ময়লা জলে এক ধরনের পোকা থাকে যার নাম Faecal Coliform, এদের দুজনের মধ্যে Carbon Dioxide এবং Oxygen আদান প্রদান হয়, পদ্ধতিটিকে বলে Algae Bacteria Symbiosis. এছাড়া সূর্য-রশ্মির সাহায্যে জৈব প্রথায় খাবার তৈরী হয় সালোক- সংশ্লেষের (Photosynthesis) এর মাধ্যমে। এই একাধিক জৈব-রাসায়নিক (Biochemical) পদ্ধতির দ্বারা Algae-র পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সেটিই মাছের খাবার হিসেবে কাজ করে। একই সঙ্গে Faecal Coliform-এরও রাসায়নিক পরিবর্তন হয় এবং সে তার ক্ষতিকারক চরিত্র হারিয়ে ফেলে। ক্রান্তীয় দেশের শহরে যেখানে প্রচুর সূর্যরশ্মি আসে, সেখানে শহরের ময়লা জল পরিশোধনের সবচেয়ে ব্যয়সাধ্য উপায় হল অগভীর পুকুরে সূর্য-রশ্মির উপস্থিতিতে ময়লা জলে মাছ চাষ।

এই মাছ খাবারের পক্ষে কতটা উপযুক্ত এবং নিরাপদ এই নিয়ে বিভিন্ন সময় গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে খাবার সময় মাছের আঁশ, কানকো এবং ডানার অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে, মাছ ভালো করে ভেজে তবে খাওয়া হয়, তাই তাদের ক্ষতিকারক কোন অংশ খাবার হিসেবে আমাদের খাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। বর্তমান গবেষণার দ্বারা এটা প্রমাণিত যে সঠিক নিয়ম ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ময়লা জল ব্যবহার করে উৎপাদিত খাবার গ্রহণ মানব শরীরের পক্ষে নিরাপদ।

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ ১৯৮১ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এই জায়গার নামকরণ, মানচিত্র অঙ্কন, বিশ্বের দরবারে তার কাহিনী তুলে ধরা, Ganga Action Plan-এর প্রেক্ষিতে জলাভূমির স্বীকৃতি প্রাপ্তি এবং তারপরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Ramsar জলাভূমির স্বীকৃতি প্রাপ্তি – এই সবকিছুর পেছনে নিষ্ঠা সহকারে কাজ করেছেন। তারপর তিনি তার সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে East Kolkata Wetland Management Authority তৈরী হয় যাতে জলাভূমি সংরক্ষণের প্রশাসনিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা যায়।

জলাভূমির কিছু টুকরো ছবি

বর্তমান কিছু সমস্যার কথা

১৯৬০ এর দশকে এই এলাকাটির একটা বড় অংশকে জলাভূমির চরিত্র পালটে মানুষের বসবাসের জায়গা হিসেবে তৈরি করা হয় এবং এখানকার মাছ উৎপাদন অনেকটা কমে যায়। সেই নগরায়ণ ছিল পরিকল্পিত নগরায়ণ আর আজকের দিনে জলাভূমিতে চোরাগোপ্তা অপরিকল্পিত নগরায়ণ জলাভূমির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মৎস্যজীবীদের ক্ষতি আগেও হয়েছিল, এখনও হচ্ছে। ২০১৫ সালে Indian Council of Social Science Research এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান Eastern Regional Centre একটি গবেষণার সূচনা করে যার দ্বারা বোঝা যায় যে ১৯৯৭ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে সারা বছর চলে এমন ভেড়ির সংখ্যা ২৬৪ থেকে কমে ২০২ হয়েছে। জলাভূমির মানচিত্র যখন প্রথম করা হয়, তখন মৌজা সংখ্যা ছিল ৩২। তার মধ্যে একটি বড় মৌজা ছিল

ভগবানপুর মৌজা। ২০০১ থেকে ২০১১ এর মধ্যে এই মৌজার জনসংখ্যা চারগুণ বেড়ে যায়। জল অংশ ২০০২ সালে ছিল ৮৮ শতাংশ, ২০০৬ সালে ৫৭ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ১৯ শতাংশ। বসবাসের অংশ ২০০২ তে ০.১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ১৩ শতাংশ হয়ে যায়।

ময়লা জলের অভাব

শহরের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ময়লা জলের যোগান কমে যাচ্ছে। এর কারণ খতিয়ে দেখার তেমন চেষ্টা করা হয়নি, তবে বর্তমানে কিছু গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে শহরের মাটির নীচের ময়লা জলের বাহক খালগুলি পরিষ্কার করা দ্রুত প্রয়োজন। তাছাড়া ভেড়ি খনন ও প্রয়োজন। অর্থের অভাবে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হচ্ছে না। এর জন্য যে সমস্যা তৈরী হচ্ছে তাতে খাদ্যের উৎপাদন কমে যাচ্ছে, মানুষের জীবিকার অনিশ্চয়তা বেড়ে যাচ্ছে। আমরা এক অবশ্যম্ভাবী বিনাশের দিকে তাকিয়ে আছি।

এখনকার নিকাশী ও ময়লা জল নির্গমনের সমস্যা

২০০১ সালে World Bank কলকাতা পুরসভার অনুরোধে নিকাশী ও ময়লা জল নির্গমনের উপর একটি রিপোর্ট তৈরী করে যাতে বলা হয় ৪.৪ মিলিয়ন লোক এখানে বসবাস করছে, গত ৩-৪ দশকের এই অতি-দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ময়লা জলের বহমানতা পরিবর্তিত হয়েছে এবং pumping station এর সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে। রিপোর্টে বলা হয় যে খাল সংস্কার নিয়মিত করতে হবে, বানতলার Lock Gate সারাতে হবে (সম্পন্ন হয়েছে) আর ঘুষিঘাটাতে pumping station বসাতে হবে। এটি সম্পর্কে আরও গবেষণার মাধ্যমে pumping station এখন আদৌ দরকার আছে কিনা, তা IIT Kharagpur খতিয়ে দেখছে। যে সমস্যাটি একটুও আলোচিত হয়নি সেটি হল সাধারণ মানুষের চেতনার অভাব, তারা কঠিন বর্জ্য ময়লা জলের খালে ফেলে দেয় এবং তাতে খাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

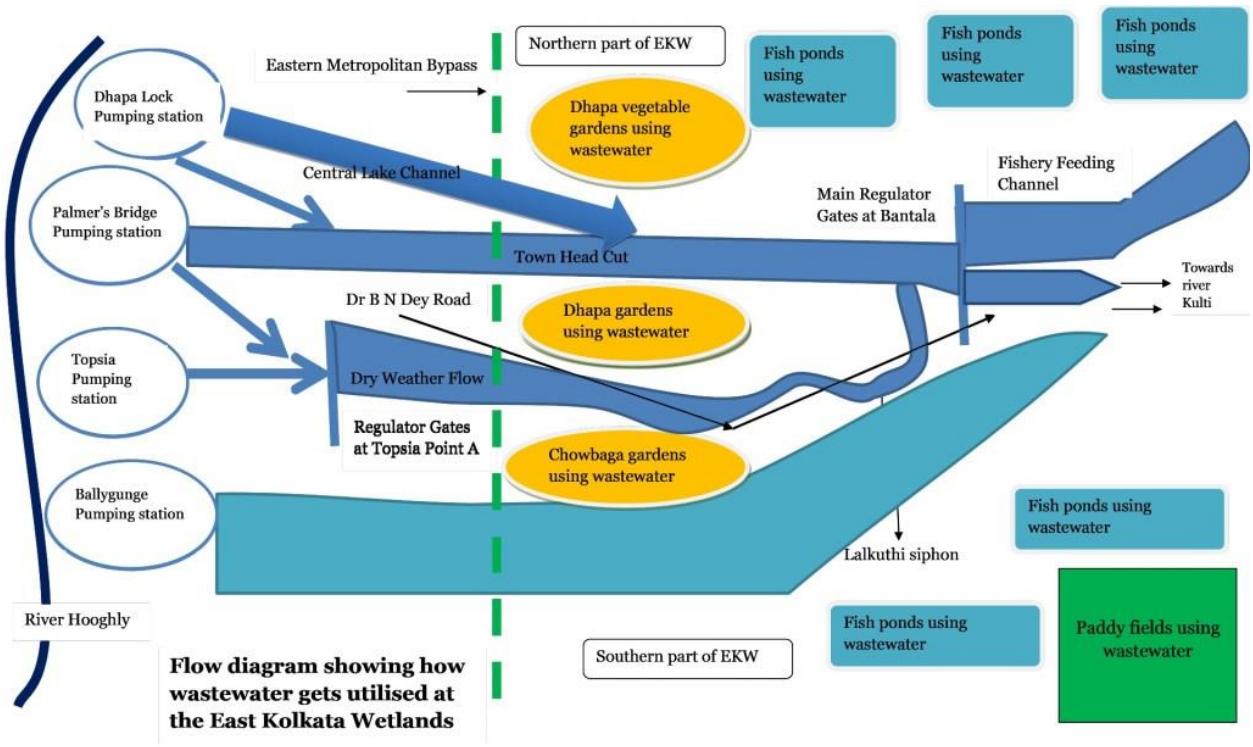

Storm Weather Flow, Dry Weather Flow and Town Head Cut are long-lead channels that carry sewage out of the city to the River Kulti over a distance of 17 miles. By Dhruba Das Gupta on behalf of SCOPE, Kolkata

সমাপ্তি ~ জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতের পথ

কলকাতা শহরের ময়লা জল পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে টিকিয়ে রেখেছে, আবার জলাভূমি নিখরচায় ময়লা জল পরিষ্কার করে শহরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই পারস্পরিক সহাবস্থানের রূপকারেরা আজ থেকে নব্বই বছর আগে যে কতটা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা আজকের এই জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম বাস্তবের দিনে তীব্রভাবে উপলব্ধি করা যায়। শহরের বাইরে নিকাশী নিয়ে যাওয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ততটাই প্রয়োজনীয় ছিল শহরের অভ্যন্তরীণ নিকাশী ব্যবস্থার সঠিক পরিকল্পনা, সেই সবকিছুই ড: বীরেন্দ্র নাথ দে'র হাত ধরে গড়ে উঠেছিল – তিনি pumping station এর সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে আরো বৃদ্ধি পায়। এই ১৭ মাইল লম্বা নিকাশী খাল তৈরী হবার ফলে অতিবৃষ্টিতেও শহরের দীর্ঘ সময় জলমগ্ন হবার আশঙ্কা থাকেনা। জলবায়ু পরিবর্তনের নিরিখে অতিবৃষ্টি এবং দীর্ঘায়িত প্লাবনের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাই। নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শহরের নিকাশী ব্যবস্থা, ময়লা জল পরিশোধন ব্যবস্থা এবং খাদ্য উৎপাদক জলাভূমির এই সমন্বয় সাধন আমাদের শহরকেটিকে থাকতে সাহায্য করেছে। কারিগরি বিদ্যা জনস্বার্থে এবং প্রকৃতি-বান্ধব উপায় মেনে কাজে লাগালে যে ফল ভালো হতে পারে, এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ পূর্ব কলকাতার

জলাভূমি। শহরের কাছে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকলে আসলে যে শহরটার টিকে থাকার ক্ষমতা (sustainability) বৃদ্ধি পায়, এই জলাভূমিটি তার প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। বিশেষ করে Irrigation দপ্তর খুব ভালো করে বোঝেন যে এই নিকাশী ব্যবস্থা কলকাতা শহরকে ধারণ করে রেখেছে। সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল যে জলাভূমি সমাজ এই এলাকার ecology-কে ধরে রেখেছে এবং ময়লা জল ব্যবহার করে গ্রাম এবং শহরের পরিকাঠামোগত সমন্বয়কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষের সৃজনশীলতা সঠিক দিকে পরিচালিত হলে যে Ecology এবং সমাজ দুটোই টিকে থাকে, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি তা প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

শ্রদ্ধেয় যাঁরা

এই লেখাটি কয়েকজন নমস্য ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন। ড: বীরেন্দ্র নাথ দে অন্যতম, তিনি আমাদের শহরের আগামীর নিকাশীর রূপকার ছিলেন। পি.সি বোস তাঁর পরেই এসে কেবলমাত্র পূর্বসুরীর কাজ এগিয়ে নিয়ে যান নি, তিনি স্মরণীয় থাকবেন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার জন্য এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আগামী প্রজন্মকে সজাগ করার জন্য। ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ এই আশ্চর্য অথচ বিস্মৃত জলাভূমির কাহিনী পুনরুজ্জীবিত করে সারা বিশ্বকে ময়লা জল দিয়ে জীবিকা নির্বাহের জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন, সেটি মনে দাগ কেটেছিল। আর আছেন বর্ষীয়ান মৎস্যজীবী তপন মন্ডল যিনি জলাভূমিকে নিয়ে আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। জলাভূমি সমাজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা এই শহরের বেঁচে থাকার চাবিকাঠিকে টিকিয়ে রেখেছেন। সব শেষে শ্রদ্ধা জানাই মাকে, ওঁর খুব আগ্রহ ছিল পুরো লেখাটা দেখে যাবার, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ওঁর আশীর্বাদের উপলব্ধিটুকুই আমার সম্বল ছিল।

প্রচ্ছদ ও ছবিসমূহ: ধ্রুবা দাশগুপ্ত ও অমৃতা চট্টোপাধ্যায়

দোহাই

এই লেখাটি এর আগে Institute Of Civil Engineering (ICE), UK দ্বারা প্রকাশিত " Engineering History And Heritage" সংকলন -এ "East Kolkata Wetlands : Integrating Sanitation, Engineering And Technology" নামে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ধ্রুবা দাশ গুপ্ত থার্ড লেন-এর পরিবেশ সংকলন উপলক্ষে ICE-এর অনুমতিসহ লেখাটি অনুবাদ করেছেন।

*****

Sundarbans: The Land of Eighteen Tides

Debojyoti Das

Drawing by Frederic Peter Layard after an original sketch of 1839. Picture Credit: Wikimedia Commons

River deltas comprise just one percent of global landscape but support over half a billion people. As you can see from the satellite imagery below, the Bay of Bengal delta is an amorphous space-an admixture of land and water, a cultural ecotone that transcends the political boundaries of India and Bangladesh. In recent years the littoral region has come to be recognised as 'the ground zero of climate change'. While deltas are nowadays considered important food baskets that have increasingly become vulnerable to food insecurity and environmental degradation, they have also remained largely marginal to national imagination and have been neglected within the discipline of area studies. With increasing threats from global warning and sea level rise, deltas must now take centre-stage in understanding the 'grand challenges' of our time before it is too late.

Before the universalisation of the term Sundarbans (etymologically meaning 'beautiful forest'), the part land and part water landscape were referred to in the literature of the Middle Ages as the land of eighteen tides, *atharo bhatir desh*. This reflected the agency of the watery landscape; and recognized the 'tides', 'ocean', 'rivers' and 'tributaries' that shape the history, culture and ecology of the deltas.

Satellite image of the Sundarbans, world's largest bird footed delta (photo credit: Deimos imaging SLU)

The delta is one of the most amazing examples of a transient environment where nothing remains permanent. The landmass is constantly on the move – shaped by the fluvial processes of the Ganges, the Brahmaputra and the Padma River. The Sundarbans form the largest bird-footed delta in the world and support a megaphonic 'ecotone' composed of the mangrove ecosystem that support biodiversity and shields the islands from tropical storms and deadly cyclones.

Legend has it that the Sundarban delta is a part of the *patal lok* mentioned in our *puranic* literature that signifies the underworld -a place of hell teeming with serpents, crocodiles and other more-than-human entities that represent darkness, evil

and chaos. From the *puranic* literature to the contemporary times, the delta has emerged as an excluded exotic space in the popular imagination of Bengal – the sinister mythological representations got reinforced by the colonial characterization of the deltas' vast saturated landmass as unproductive 'waste'land to be reclaimed through the building of embankments and the clearing of mangrove forests for human habitation that started in the late 18th century with the passing of Permeant Settlement Act.

This colonial intervention was crucial in the history of the deltas This colonial intervention was the first of its kind and remains crucial in the history of the deltas, - for it imposed on the region, the distinctly western notion of land-based "property-thinking" that ultimately shaped the utilitarian project of imagining the watery landscape as a revenue frontier of Bengal Presidency. This had a significant impact on the local ecology as it also led to the property-based approach of looking at certain kinds of land as unproductive land or "Wasteland". The ethical framework behind this line of thought came from English utilitarian thinkers like John Lock and John Stewart Mill. In this context the vast mangrove wetlands emerged as "wastelands" in the eyes of colonial administrators who wanted this primarily fluvial geography to be reclaimed for settled agriculture that will fill the coffers of the Bengal Presidency. This kind of unilateral imagination of nature had its own pitfalls as, over time, it exposed the delta environment to severe tropical storms, cyclones and Tsunami as the mangrove forest cover was cleared to create settlements for immigrants and landless peasants.

The Sundarbans: A Cultural Ecotone

The deltas are a part of a biodiversity hotspot- a 'megafauna' that connects the region with the wider littoral world. The interconnectedness and coexistence of human

communities and cultures produces diverse landscapes, which can well be compared with the diversity of human geography and the notion of the 'ecotone' in ecology.

In the recent past, the concept of 'ecotone' has found a wide range of application – from the world of environmental studies or landscape geography to a broad space of human geography. For cultural geographers and environmental anthropologists who have promoted the ontological turn in social theory since the 1990s, the emphasis on elements andspecies beyond the human presents the cosmopolitan understanding of the relationship between nature and culture.

According to Mark Sutton and E.N. Anderson, 'cultural ecotone' is a contact zone where the cultural space of two different communities of human beings with diverse socio-ecological realities meet and merge. In the context of Sundarbans, it is represented in subsistence agriculture-based economies of peasants that has merged with fisherfolk and forest gores which in turn comprise a variety of caste groups. This is a zone of intercultural encounter where the seeds of transculturality have been incubated and grown, over several historical periods. The Sundarban deltas present a 'cultural ecotone' where the confluence of different tribes, races, communities and belief systems has produced a hybrid social space reflected in people's everyday practices such as the worship of *Bonbibi*, the lady of the forest, who belongs to the vernacular liturgical tradition of the region and symbolises the unity between the Hindu and Muslim pantheon in the island. The works of stalwart historians like Richard Eaton (1993) and Nile Green (2008) offer exciting possibilities for deconstructing the old paradigm of Islam as a monolithic 'World Religion' and Hinduism as a Sanskrit-ised Indological tradition. The Bengal delta with its unique geography and 'ecotonic' transition has historically played the role of a corridor to nurture an exciting space for transregional diffusion of cultures and beliefs that have produced 'hybrids'. Here hard borders/ boundaries are absent and

do not define social identity. Rather identities are co-produced by the liminal nature of these shifting landscapes that are malleable and ever changing with the turning tides, cyclones, floods, and the migration of people across the Indian Ocean world.

Reading The Sundarbans: The Literature of The Deltas

While the *puthi* literature presents a genealogical understanding of nature and culture, these records were written and commissioned by the privileged Bengali Brahmins who introduced *Dharam* worship into the region by adopting local gods into the wider ambit of Hindu fold. Examples of this religious co-opting can be found in the eulogizing of *Manasa* the goddess of serpents, *Sitala* the goddess of measles and the battle of *Dakhin Rai* and *Bonbibi* who have long been classified as folk deities. This incorporation of local sylvan deities into the religious pantheons of Bengal itself hints at the creation of a hybrid social space within the Sankrit-ised Hindu fold. This transformation occurred primarily in the marshy parts of the Sundarbans deltas now in Bangladesh, beyond the *Rhar bhumi* (the eastern part of Bengal, east of Ganges River).

While anthropologists have classified the local beliefs into a two-tier system with 'little' and 'great' traditions, I find this classification challenging because there are various versions of *Ramayan* and *Mahabhara* retold by local scholars, scribe writers and narrated by local scroll artists- *patachitrakars* and doggerel poem singers. Rather, the diffusion between great epics and the 'little' local traditions is what expresses the liminal religiosity and syncretic religious practices of the Sundarbans delta. For example, Pika Ghosh (2003, pp 387) in her work *Unrolling a scroll narrative*, observes that the 'goddess Durga plays a prominent role in the Bengali version of the *Ramayan* on behalf of Rama in his battle with Ravana'. In Bengal, which had no "authentic" classical tradition of its own, folk culture came to

be seen not merely as the archetypal Other but also as the source of a reconstituted tradition that the region could hold up as an exemplar for India as a whole. Beginning with its roots in the ideology of romantic nationalism, folklore has thus seen much reordering in contemporary India.

Bahadur chitrakar – scroll painter of Medinipur (Naya Pingla village) reciting Ramayana with Durga as protagonist (Proto credit Dr. Anindita Kundu Saha).

The *puthi* literature of the Sundarban deltas thus provides a diachronic understanding of the social and political ecology of the region. In this article, I will try to argue why conservation efforts and community work in the region need to go hand in hand – it is important, while caring for the environment in the deltas to understand not only the bio physical ecotone of the region but also the social and cultural hybridity of the place. The foundation of my ontology stands on two premises- 1). The 'ethics of care' for non-human subjects and the morality of controlling self-indulgence highlighted in *puthi* literature and, 2). The growing debate within deep ecological thinking about ecological egalinitarism and biocentrism, a move that distinctly shifts away from the earlier positivist and post-enlightenment anthropocentrism. These concepts are crucial towards understanding human care for the non-human. The human and non-human aspects of nature cannot be seen as the competing ecologies that modern scientific shallow ecological discourse would have usbelieve. The *puthi* literature, for example, *Bonobibi Jawaharnama* and *Manasa Mangal* attend to the concepts of biocentrism and ecological egalinitarism where humans are seen as part of nature and not as dominant or superior agents.

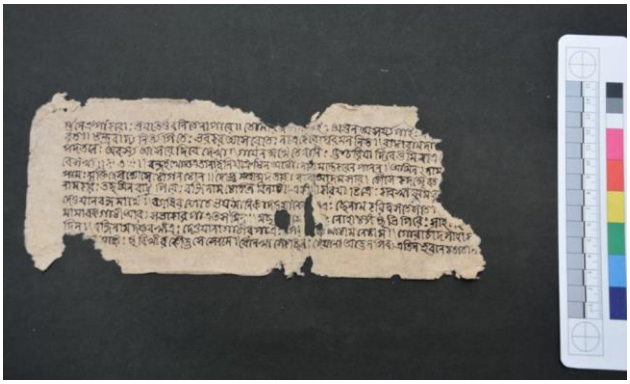

Folio of Satya Pirer Panchali, 19th Century, Sundarban Ancholik Sangraysala Collection. BL EAP 759 collection.

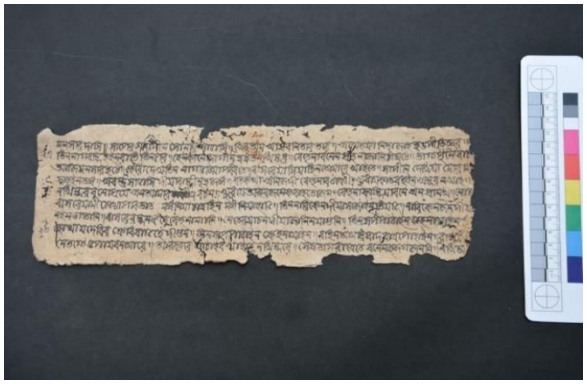

Folio of Manasa Mangal- 17th century, South 24 Pargana, West Bengal, India (Source: British Library EAP 759 project image).

The Importance of Land Over Water In An Amphibious Ecotone

Notably, much of this research on Sundarbans' literature has been essentially on *terra firma*: the obsession with permanence and stable land still remains unquestioned when talking about hybridity. Such an unchallenged acceptance of land-based physical environment as the essence of landscape assemblages contradicts the fluidity inherent in the conceptualisation of hybridity. More importantly, it undermines the postcolonial origins of the idea of hybridity and its association with anti-essentialism as proposed by Bhabha and Nandy (see Bhabha, 1994; Nandy, 1983). In other words, the invocation of socio-natural might risk the conceptualization of hybridity in precisely absolute terms, leaning instead, upon the amalgamation of two or more elements. This is true of the Sundarbans delta where the *Puthi* literature has been appropriated by Bengali scribe writers and proponents of *Dharma* Sanskritised literature during the Middle Ages to support popular aspiration of the society as well as elevate localised belief system to the mainstream pantheon of Hinduism. The one-dimensional classification of 'little' and 'great' traditions as autonomous belief practices proposed in the ethnographies of McKim Marriot and Milton Singer through their studies among small communities in India during the 1960-70 established a rupture in the study of complex Indian society influenced by orientalist-Indological thinking and Sanskritization which was not very popular in Bengals littoral environment where people still wrote in vernacular Bengali and were embedded in popular cultural practices. The great epics of Hinduism such as *Ramayan* and *Mahabharat* also find regional variations in the text and multiple meanings are drawn out of these epics in the local context by scroll painters- *patachitrakars* of Bengal. As historian Jawahar Sarkar notes, "the valorising of the popular deities of the 'depressed' masses of the region would, in effect, permit or facilitate the Brahman's entry into this hitherto-abjured realm of

'low' local worships. Both the two acts of adjustment, popular deities of the *antyajas* within the Hindu pantheon and of the 'new agriculturists' who rose largely from among these forsaken castes that were either within or on the periphery of the Hindu fold".

"Though *Dharma, Manasa, Chandi* and the peasant-*Shiva* of Bengal were the main folk deities that thus entered the general Hindu's pantheon in western Bengal, thanks chiefly to this genre of balladic poems, even lesser goddesses like *Annada, Kalika, Sitala* and *Shasthi*, as well as minor male divinities such as *Dakshin Ray* and *Panchananda*, also received homage through their respective *Mangals*." (Sarkar 2010).

According to Sarkar, "The *Mangal Kavyas* were in the language of the masses – Bangla – and were undertaken not by Brahman scholars of high standing and repute at the well-maintained 'seminaries', but by individual rural poets, most of who were Brahmins — perhaps with no coordination among themselves".

Likewise, this cultural hybridity is reflected in the contacts that the littoral rim has established with the wider Indian Ocean world across west, middle and southeast Asia from where Islamic influence has penetrated through presentization carried out by *pirs*– holy saints of the Bengal delta detached from the Mughal empires of central India.

Colonial Property Rights in The Delta: Fashioning Hard Borders/Edges

The colonial period was a watershed in the delta's history that swept their hybrid landscape under the carpet by promoting a false material consciousness of 'waste' developed out of Locke's 'natural rights', by dividing land and water into units of quantifiable objects for economic use. As a consequence, land reclamation gained

momentum in the Bengal delta through construction of embankments and dikes that were originally not designed for permanent human habitation. This brought cataclysmic change to the physical landscape of the delta.

According to Rohan D'souza the Cartesian division of land from water was driven by revenue concerns of the Bengal presidency that resulted in control of the river and its flow. The Bengal delta soon became 'the great environmental laboratory' (Hill, 1997) to 'test European theories on the purpose, use, and control of nature in all its manifestations, the annual floods became more disastrous and riverbank erosion increased' (Lahiri-Dutt, 2008). Both the Permanent Settlement Act 1793 and Bengal Alluvium and Diluvium Act of 1825 established absolute and permanent land rights over a fluid and transforming landscape leading to the creation of artificial hard borders that were contested in the court of law by local owners of the land. Legal jurisdiction of land went hand in hand with engineering and techno-managerial controls imposed by hydraulic experts. In this process the fluid and transient world of the delta's waterscape became invisible as land became central to colonial capitalist and mercantile expropriation. This notion continues to hold sway in the postcolonial period.

The Forest Frontier In ***Badabhon***

With the extension of power that has come from the western pursuit of modernisation and creation of timber plantation, forests have become the target of exploitation for their natural resources. The term 'political forest' (Vandergeest and Peluso, 2015, as cited by Devine & Baca, 2020) captures the notion that today's forests have been *produced* through politics. A history of colonial powers, intervention by international organisations, economic values, and politics from complex articulations of power and practice have transformed forests from 'natural

entities' to "territorial zones" and "state-held territories" (Devine & Baca, 2020) . The "modern forest" is a place where the politics of sustainability can clearly be observed.

Arguably, the greatest contributions have been made by environmental historians who have illuminated the changing relationship between humanity and nature (see Radkau, 2008). Their early work attempted to emphasise the "social construction" of nature, such as forests (see Jeffrey, 1998). From this, studies moved on to what Agrawal and Sivaramakrishnan (2001) describe as "social nature", where the artificiality of boundaries between arable lands, forests, and pastures are demolished, problematizing the ways in which certain modes of livelihoods are commonly associated with each of these categories. Environmental historians have reminded us that these are primarily applied administrative categories (Whitehead, 2010) marked by significant movements within and between them. They have recognized the unclassifiable mixed cases and the strong interdependence between various modes of livelihood, the radical changes in landscapes over time, and human strategies of land use that defy the simple distinctions (Scott, 2001, vii). Another thread in their work has been intensive questioning of what comprises environmental knowledge, not only critiquing the subjective position of knowledge producers, but also investigating how knowledge is produced, contested, legitimated, and hybridized (Skaria, 1999). In South Asia, environmental scholars have emphasized the interdependence of biophysical and socio-cultural domains and highlighted the importance of considering poor people's livelihoods as entrenched in local ecology (Gadgil and Guha, 1992; Guha, 1994). The Sundarban deltas have also been part of this treatment.

Khitish Bishals oil painting representing destruction of forest in the Sundarbans.

The archipelago of the Sunderbans are classical examples of lands at the margins; they are elusive and indefinable. By turning them into revenue generating paddy and shrimp farms, we thought we were protecting them as well as ourselves. Embankments and polders increase the force of wave action and lead to greater coastal erosion and rise in salinity level. Building embankments across the Sundarbans to reclaim wetlands in the last one hundred years did not expand the food basket of the Bengal delta, but merely deprived its contiguous farmlands of vital nutrients. Construction of dams and straightening of rivers have been equally disastrous for the lives of fish, animals and the people that rely on them.

According to Professor R. A Gillis, 'Living an ecotonal existence, islanders are amazingly sensitive and adaptable to the conditions of both land and water. Their relationship to nature is by no means passive. Indeed, they have been shaping their own environments for millennia.' (Gillis: p158). It is particularly important to understand that island history is a co-construction of humans and nature. Global history has enough lessons to make us wary of reifying political borders, but we must also be prepared to treat our so-called natural boundaries as equally liquid. Land and water constitute an ecological continuum. We need to be wary of distinguishing the marine too sharply from the terrestrial.

Until quite recently, deltas have been regarded as marginal. Island communities have been of secondary interest to historians and geographers. But now we are beginning to appreciate the centrality of the marginal. Take the delta mangroves, for example. For most of the twentieth century, thousands of kilometres of mangroves have been destroyed in the name of agricultural modernization and urbanization. But now this ecotonal feature is again being recognized as vital to the health of the fields it borders, and to the maintenance of biodiversity generally, after decades of ploughing right up to the edges of their fields, farmers have begun to become aware of the vulnerability of monocultures, the disappearance not only of plant, but animal and bird species. Lately, farmers are again hedging their fields, creating ecotones between forest and field, streams and pastures to prevent erosion and pollution, thereby protecting their bets against flood and tropical cyclones. It is in this moment of planatary crisis- climate change- that we are rediscovering the need for reimagining evanescent environment such as deltas as culturally and socially relevant.

Declining mangrove forest of the Sundarbans Delta: Kumirmari, South 24 Pargana, India

Human activities in the Sundarbans delta: Concrete Road and embankment building programme after Aila cyclone in 2009.

*****

পরিবেশগত উদ্বাস্তু: বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন জনপদে মানুষের ঢেউ

গৌরাঙ্গ নন্দী

বাংলাদেশ-এর ক্লাইমেট রিফিউজি সমস্যা - ছবি: ইউনিসেফ

সুন্দরবন সংলগ্ন দাকোপ উপজেলার ঢাকি নদীর তীরে বাড়ি ছিল মনোরঞ্জন রায়ের। এলাকার মধ্যে ধনাঢ্য পরিবার হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আচমকাই ২০০৯ সালের ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আইলায় তাঁর মহা-সর্বনাশ ঘটে। তাঁর বাড়ি-ঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এক বছরের মধ্যেই চোখের সামনে একটু একটু করে বাড়ি-ঘর, গাছ-গাছালি সহ ষাট বিঘে জমি নদীর সাথে মিশে যায়। তিনি এখন পাশের গ্রাম কামারখোলায় জমি কিনে বাড়ি করেছেন; তবে ছোট ভাইয়ের আবাস হয়েছে চালনায় (দাকোপ উপজেলা সদরে)। তিন ছেলের এক ছেলে থাকেন উপজেলা সদরে, এক ছেলে জেলা সদর খুলনা শহরে এবং আর এক ছেলে থাকেন ভারতের আসাম রাজ্যে।

সুন্দরবন উপকূলীয় জনপদে মনোরঞ্জন রায়ের মত অসংখ্য গল্প ছড়িয়ে আছে। সামর্থ্য ছিল বলেই তিনি আবারও জমি কিনে কাছেই বাড়ি করতে পেরেছেন; যাঁর সামর্থ্য নেই তিনি কাজ পাওয়া যাবে এমন সুবিধামত জায়গায় চলে গিয়েছেন; তাই সেটি নিকটবর্তী উপজেলা বা জেলা শহর হোক, দেশের যে কোন প্রান্তে হোক অথবা দেশান্তরেই হোক, মানুষ এলাকা ছেড়ে যাচ্ছে। এটি স্থানান্তর (মাইগ্রেশন), স্থানচ্যুতি (ডিসপ্লেসমেন্ট), না-কি পরিবেশগত উদ্বাস্তু তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে; তবে মানুষ যে এলাকা ছাড়ছে, এটা সত্যি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীতি-নির্ধারণী মহল একথা স্বীকার করতে চায় না, গোলটা বাধে, এখানেই।

ভৌগোলিক অবস্থান

দুর্যোগে-দুর্ভোগে পড়ে মানুষের স্থানত্যাগ- এই বিষয়টি দেখা হয়েছে সুন্দরবন (বাংলাদেশ অংশ) সংলগ্ন খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ও সুতারখালি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গড়ে ওঠা একটি দ্বীপাঞ্চল কে কেন্দ্র করে। এটি বা-পাউবো (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)-এর ৩২ নং পোল্ডার। এর চারপাশেই নদী। উত্তরে ঢাকি নদী, পশ্চিমে শিবসা নদী, পূর্বে ভদ্রা এবং দক্ষিণে সুতারখালি (ভদ্রা) নদী। তিন দিকে বসতি; একপাশে সুন্দরবন। এলাকাটি একটি প্লেটের ন্যায়, নদীর ধারে বসতি এলাকা অপেক্ষাকৃত উঁচু, তুলনায় ভিতরকার ভূমি নীচু। ১৯৬০এর দশকে নদী-বাঁধ দিয়ে একটি সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা পোল্ডার (নদী-বাঁধ, স্লুইস গেইট প্রভৃতি সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে পোল্ডার বলে। এটি একটি ডাচ শব্দ) গড়ে তোলা হয়। ১৯৮০এর দশকে এই নদী-বাঁধ কেটে নদীর নোনা পানি তুলে বহিরাগতরা চিংড়ি চাষ শুরু করে; পরবর্তীতে স্থানীয়রাও চিংড়ি চাষে সম্পৃক্ত হয়। ২০০৭ সালের দিকে স্থানীয়রা চিংড়ি চাষ ছেড়ে আবারও ধান চাষে ফিরে আসেন। ততোদিনে নোনা পানি তুলতে বারংবার নদী-বাঁধ কাটায় তা দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্যদিকে নদীতে জোয়ারের প্রাবল্য দেখা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঘন ঘন

সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসের দাপটে নদী-ভাঙ্গন একটি গুরুতর প্রাকৃতিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এলাকা ছেড়ে যাওয়া মানুষেরা

মনোরঞ্জন রায়ের পরিবারে বিপর্যয় শুরু হয় ঘূর্ণিঝড় আইলার সময় হতে। ২০০৯ সালের ২৫ মে আইলা আঘাত হানে। দাকোপের ঢাকি নদীর পাড়ে বাঁধ ছিল, যা ওই ঝড়ের দিনে ভেঙ্গে যায়; যাতে একটি নালা তৈরি হয়। বাঁধের ভাঙ্গনটি যখন ছোট ছিল, তখন কেউই গুরুত্ব দেয়নি। পরে যখন ভাঙন মেরামত করে বাঁধ পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হলো, তখন আর নদীর শ্রোত আটকানো যায়নি। ভাঙন ততদিনে অনেক বড় হয়েছে। নদীর জোয়ারের প্রবল চাপে সেই নালা ধীরে ধীরে বড় হয়। পানি হু হু করে বিলমুখো প্রবেশ করতে থাকে, আর ভাঙ্গনের স্থান আরও বড় হতে থাকে, যা এক সময়ে বিশাল এক নদীর আকার ধারণ করে। আর এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আশেপাশের জনপদ ভাঙতে শুরু করে। এর ফল হিসেবে ছোট জালিয়াখালি গ্রামটি সম্পূর্ণ নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। পাল্টে গেছে খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ইউনিয়নের মানচিত্র। এর ফলে ছোট জালিয়াখালির মানুষগুলো একেবারে পথে বসেছে। অবশ্য, এখন সেখানে বিশাল এলাকা বাদ দিয়ে বাঁধ *(চিত্র-১)* দেওয়া হয়েছে। বাদ দেওয়া এলাকাটি এখনও জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যায়, ভাটায় পানি সরে গেলে ভেসে ওঠে।

চিত্র ১: আইলার পরে জালিয়াখালিতে নতুন করে দেওয়া বাঁধের একাংশ।

গ্রামটি গিয়েছে, গ্রামের মানুষগুলোর মধ্যে ২২টি পরিবার এখনও বাঁধের কোণায় বসবাস করে; বাকি সকলেই তাদের সুবিধেমত জায়গায় চলে গিয়েছে। এলাকাবাসীর তথ্যমতে, ছোট জালিয়াখালি গ্রামে ৮০টি পরিবার বসবাস করত। লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০। *(চিত্রসমূহ-২)*

চিত্রসমূহ-২: জালিয়াখালির নদীভাঙ্গনের কুলে (নদী-বাঁধের বাইরে) ভিটেহারা মানুষের বাস।

মনোরঞ্জন রায়

মনোরঞ্জন রায় (৭২) জানান, তাঁর বসতবাড়িসহ ফসলের জমি ছিল প্রায় ৬০ বিঘা। তিনি ও তাঁর ভাইয়ের চারটি একতলা পাকা ভবন ছিল। ধানের গোলা ছিল। তাঁর একারই নারকেল গাছ ছিল ৬৫টি। আইলার আঘাতে এলাকা প্লাবিত হলে তাঁর বাড়িঘরও পানিতে ডুবে যায়, তাঁর পরিবারসহ গ্রামটির সকলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাঁধের অক্ষত স্থানে ঠাঁই নেন।

তাঁর বাড়িটি ভাঙ্গনের মুখে পড়ে। প্রতিদিন একটু একটু করে তাঁর বাড়িটি নদীতে তলিয়ে যেতে থাকে। যতো দিন গেছে ততো তাঁর জমি নদীর পেটে গেছে। চোখের সামনেই তিনি এভাবে তাঁর সম্পদ হারিয়ে যেতে দেখেন। মনোরঞ্জন রায়ের কথায়, 'চোখের সামনেই আমার বাড়িসহ গোটা গ্রামটি হারায় গেল। মানচিত্র বদলে গেল।'

নদী-বাঁধের বাইরে (নদীর কুলে) বসবাসরতদের খাবার ও পানি রাখার পাত্র

দুর্ভোগে পড়া মানুষেরা জানান, ভাঙ্গনের ওই স্থানে বাঁধ খুবই দুর্বল ছিল। বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য সেখানে বাঁধ কেটে ক্ষত তৈরি করা হয়েছিল। আইলায় সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের তোড়ে ওই ভাঙ্গা স্থানটি বড় হয়। যা পরে আরও বড় হয়ে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটায়। আইলায় টিকে থাকা বাঁধের উপর বছরের পর বছর পরিবারগুলো টিকেছিল।

পুনর্বাসনের কোন আশা না দেখে একে একে প্রায় সকলেই স্থান ত্যাগ করেছে। এখানকার অনেকগুলো পরিবার ভারতে চলে গিয়েছে। এদের মধ্যে রণজিৎ রায়, মনোজিৎ রায়, ভূপতি জোদ্দার, ভবেন জোদ্দার, তপন মন্ডল, সুশান্ত মন্ডল, স্বপন মন্ডল, অর্ণব রায় ও পূর্ণিমা মন্ডলের পরিবার অন্যতম। বিপ্লব হালদার ও নিমাই ঢালীর পরিবার ভারতে চলে গিয়েছিল, তবে তারা ফিরে এসেছে।

দাকোপ উপজেলার সর্বশেষ জনবসতি সুতারখালী ইউনিয়নের কালাবগি গ্রাম। এখানে ভদ্রা (সুতারখালি) ও শিবসা নদী মিলিত হয়ে দক্ষিণে সাগরমুখো হয়েছে। নদীর দক্ষিণ পাড়ে সুন্দরবন। উত্তরে মাটির বাঁধ দিয়ে প্রমত্তা ভদ্রা-শিবসাকে আটকে রেখে জনপদ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছে। জোয়ারের পানির দাপটে বারবার বাঁধ ভাঙছে। আর বসতি এলাকা কমছে। আইলা আঘাত হানার পর এই ভাঙনের তীব্রতা বেড়েছে। জীবনধারণ এখানে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কাজ নেই। ফসল নেই। খাবার পানি নেই। আছে নোনা পানির চিংড়ি চাষ। তাও গুটিকয়েক মানুষ তা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে উপায়হীন মানুষগুলো এলাকা ছাড়ছে। বাড়ছে উদ্বাস্তুর সংখ্যা।

এলাকাবাসী জানান, যার যেমন সুযোগ আছে, সে সেদিকে চলে গেছে। পাশের কৈলাশগঞ্জ ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে ২৬টি পরিবার নতুন বসতি গড়ে তুলেছে। তারা ওই নতুন বসতির নাম দিয়েছে ‘অতিথি পাড়া’। এদের সকলেরই বাস ছিল কালাবগিতে। তবে এখানকার পুরুষ সদস্যরা বেশিরভাগ কাজের জন্য এখনও সুন্দরবন বা কালাবগির উপর নির্ভর করে। ভোর হতে না হতেই

তারা নৌকা নিয়ে মাছ, চিংড়ি পোনা, কাঁকড়া সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় 'অতিথি পাড়া'র বাড়িতে ফেরে।

কামারখোলার ঠাকুরবাড়ি খেয়াঘাট পার হলেই কৈলাশগঞ্জের রামনগর। সামান্য এগোলেই চোখে পড়ে রাস্তার দুই ধারে গড়ে ওঠা 'অতিথি পাড়া'। এখানে বসতি তৈরি করেছেন কেনা সরদার, মোতালেব মোড়ল, পুলিন মন্ডল, গৌরপদ মন্ডল, নীহার মন্ডল, ললিত চন্দ্র মন্ডলের পরিবার। তাঁদের সবারই বাড়ি ছিল কালাবগিতে। আইলার পর ধীরে ধীরে তাঁরা এখানে এসে বসতি গড়ে তুলেছেন। এখানকার একাধিকজন জানান, কালাবগিতে বাস করার সুযোগ কমে আসছিল। নদী-ভাঙ্গনে এলাকা নদীর পেটে যাচ্ছিল। আইলার পর থেকে ভিটেমাটি আঁকড়ে বেঁচে থাকার কোনো উপায় ছিল না, সে কারণে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। কালাবগির কবির খানসহ চার পরিবারের সদস্যরা এখন বসবাস করেন খুলনা শহরের গল্লামারীর জিরো পয়েন্ট এলাকার কাছে। কবির খান বলেন, 'কালাবগিতে আমাদের জমিজমা বেশি ছিল না। থাকার জায়গাটুকু ছিল। দিনমজুরি ছিল আয়। আইলার পরে কাজের সংকট দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে খুলনা শহরে চলে আসি। এখানে শহরের কাছাকাছি থাকায় কাজ জোগাড়ে সুবিধা হয়। প্রতিদিনই কোনো না কোনো কাজ পাই, ভালোই আছি।' এখানকার পরিবারগুলো আর গ্রামে ফিরে যেতে চায় না।

সুতারখালী ইউনিয়নের বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম আছেন খুলনা শহরের বসুপাড়া রহমতপাড়া মসজিদের কাছে। আইলার পর তিনি এখানে চলে আসেন। যখন যে কাজ জোটে তাই করেন। কখনো রাজমিস্ত্রির সহকারী, কখনো দিনমজুরি, কখনো রিকশাও চালান তিনি। তাঁর ভাষায়, 'গ্রামে কাজ নেই। এখানে কাজ আছে। ভালো আছি।'

কালাবগির ভূদেব রায়ের পরিবারও এলাকা ছেড়েছে। তিনি এখন একই উপজেলার বাজুয়ায় বসবাস করেন। সুকুমার রায়ের পরিবার এখন কৈলাশগঞ্জের হরিণটানায় বাস করে। উপার্জন গাইন গেছেন বাণিশান্তায়, শ্বশুরবাড়ি এলাকায়। তবে এখানকার বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবার ভারতে চলে গেছে। ২০০৯ সালেই আইলার পরপর নির্মল রায়ের পরিবার ভারত চলে যায়। ভবেশ রায়ের পরিবার গেছে ২০১০ সালে। তিনি এখন থাকেন মহারাষ্ট্রে। ওই একই বছরে গেছে অমল রায়, মৃণাল রায় ও প্রকাশ রায়ের পরিবার। অমল ও মৃণাল রায়ের পরিবার থাকে কলকাতা শহরে। প্রকাশ রায়ের পরিবার থাকে বারাসাতের পিয়ালিতে। ২০১২ সালে ভারতে পাড়ি জমিয়েছে জিতেন্দ্রনাথ রায়, শ্যামল মন্ডল, অমল মন্ডল ও মহাদেব মন্ডলের পরিবার। আইলার পর ভদ্রা-শিবসার প্রবল ভাঙনে ভিটেমাটি হারিয়ে বুদ্ধিশ্বর গাইন ২০১৩ সালে ভারতে পাড়ি জমান।

সোনাই মল্লিকের বাড়িও ছিল সুতারখালী ইউনিয়নের নলিয়ান গ্রামে। এখন পুরো পরিবার নিয়ে ঠাঁই নিয়েছেন পাহাড়ি জনপদ বান্দরবানে। সোনাই মল্লিকের পরিবারটি আইলার পর খুলনা শহরে চলে যান। কিন্তু কিছুদিন পর জীবন-জীবিকা টিকিয়ে রাখতে চলে যান বান্দরবান। সেখানে পাহাড় কেটে জনবসতি তৈরি করা হয়েছে।

নলিয়ানের কেওড়াতলী গ্রামে নদীর পারে তাঁদের সাজানো-গোছানো ভিটে ছিলে। দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে তাঁদের ভালোই কাটছিল। ছিল গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি সবই। কিন্তু সর্বনাশা আইলা তাঁদের সব কেড়ে নিয়েছে। বসতির জমিটুকুও চলে যায় নদীগর্ভে। খুলনা শহরে গিয়েও দিন কাটানোর মতো স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি করতে না পারায় চলে যান বান্দরবান। সেখানে পাহাড়ের ওপর ঘর তৈরি করেছেন। স্বামী ও ছেলে ফার্নিচারের কাজ করেন।

আইলা-পরবর্তী নদীভাঙনে কালাবগী গ্রামের বাসিন্দা আব্দুস সালাম ঢালীর (৭০) ভিটেমাটি চলে গেলেও তিনি এলাকা ছাড়েননি। এখনো বাস করেন বাঁধে। কালাবগী বিলে তাঁর ৫০ বিঘা জমি ছিল। কিন্তু আইলার পর একটু একটু করে সব জমিই চলে গেছে নদীগর্ভে। তাঁর অভিযোগ, সরকার অনেক অনুদান দিলেও তিনি কিছুই পাননি।

নলিয়ান গ্রামের বাসিন্দা নগেন্দ্রনাথ ঢালী (৬৫) ও গুনারী বাজার এলাকার আবুল কাশেম গাজীর (৫৫) অবস্থাও তথৈবচ। তাঁরা উভয়ে একসময়ের সচ্ছল কৃষক। উৎপাদিত ধানে তাঁদের বছর চলে যেত। কিন্তু আইলার দাপটে সব কিছু খুইয়ে এখন রাস্তার ওপর বাস করেন। একই অবস্থা কয়রা, আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলায়ও। কয়রার গাতিরঘেরি গ্রাম, আশাশুনির প্রতাপনগর, শ্যামনগরের গাবুরা ও পদ্মপুকুর হতেও সাম্প্রতিককালে অনেকেই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছেন।

ইয়াশে বাঁধের ভাঙ্গনে ডুবে যাওয়া সুন্দরবন পাড়ের কয়রা উপজেলার গাতির ঘেরী গ্রামের বিধ্বস্ত বাড়ি

ইয়াশে বাঁধের ভাঙ্গন, সামনে বিধ্বস্ত গাতিরঘেরী গ্রাম

নদী-বাঁধের উপর বসতি, গাতিরঘেরী, কয়রা; শাকবেড়িয়া নদীতীরে

রাস্তার উপর বসতি, গাতিরঘেরী

জনপ্রতিনিধিরা কি বলছেন

এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া সম্পর্কে সুতারখালী ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বাসুদেব রায় একটি ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, কাজের সুযোগ না থাকা এবং জীবন-জীবিকা চলার উৎস একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানুষ এলাকা ছাড়ছে। কেউ তো আর জন্মভিটা ছেড়ে যেতে চায় না; কিন্তু যাচ্ছে, যেতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি আরো জানান, নোনা পানির দাপট থেকে মুক্ত থাকার জন্য স্বাধীনতার আগেই এখানে মাটির বাঁধ দিয়ে (নদী-বাঁধ বা পোল্ডার) নদীর নোনা পানি আটকানো হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই বাঁধ কেটে চিংড়ি চাষ শুরু হলো। আর তিন দশকের অধিক সময় চিংড়ি চাষ করার কারণে এখানকার মাটি ও পানি নোনায় সয়লাব হয়ে যায়। কোনো গাছপালা নেই। সবজি ফলে না। ধান চাষও মানুষ ঠিকভাবে করতে পারে না। আছে চিংড়ি, আর নদী থেকে চিংড়ির পোনা ধরা। গরিবরা নদী থেকে চিংড়ির পোনা ধরে। চিংড়ি চাষের জন্য নোনা পানি প্রবেশ করানোয় বাঁধের অসংখ্য জায়গায় ছিদ্র করা এবং স্থানে স্থানে কাটার ফলে বাঁধ দুর্বল হয়েছে। এখন সামান্য জোয়ারের পানির তোড়েই তা ভেঙ্গে যায়। আইলার আঘাতে বাঁধ ভেঙে এলাকাটি দুই বছর জলমগ্ন ছিল। ফলে জীবন-জীবিকা টিকিয়ে রাখতে মানুষ এলাকা ছাড়ছে।

দাকোপ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান গৌরপদ বাছাড় বলেন, পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন করার জন্য তিনি সরকারি- বেসরকারি পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। কোথাও খাসজমি পাওয়া যায়নি, তাই এদেরকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়নি।

তাঁর মতে, আইলার কারণে চারদিকে নদীবেষ্টিত কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়ন সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়ে। বাঁধ ভেঙে নদীর নোনা পানিতে দুই বছরেরও বেশি সময় এলাকা ডুবে ছিল। এলাকায় কোনো ফসল ফলেনি। ঘরবাড়ি ধসে যায়। ফলে মানুষজন উপায়হীন হয়ে এলাকা ছাড়তে শুরু করে। যার যেখানে সুবিধা আছে, সে সেখানেই গেছে। প্রকৃতপক্ষে, এখানে মানুষের জীবন-জীবিকা টিকিয়ে রাখার সুযোগ তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ। রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে এই এলাকায় জলবায়ু উদ্বাস্তু মানুষের মিছিল ঠেকানো যাবে না। তাঁর কথায়, 'আইলা-দুর্গত অনেক মানুষ এলাকা ছেড়ে গেছে। তাদের অনেকে যেমন ভারতে গেছে, তেমনি বান্দরবান, রাঙামাটিতেও গেছে। গুটিকয়েক মানুষ এখনও বাঁধের পাড়ে বসবাস করছেন।'

আইলা, আম্ফান, ইয়াশ-এর প্রভাব

ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা ও সাতক্ষীরায় প্রাণ হারান ১৯৩ জন। দুই লাখ ৪৩ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং ৯৭ হাজার একরের আমন ফসল পুরোপুরি নষ্ট হয়। প্রাথমিকভাবে আইলার ক্ষয়ক্ষতি খুবই কম হলেও দীর্ঘমেয়াদে এর ভয়ংকর প্রভাব পড়ে। ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে ধেয়ে আসা জলোচ্ছ্বাসে খুলনার দাকোপ ও কয়রা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলার ৭১১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ বিধ্বস্ত হয়। ১২টি ইউনিয়নের ২২৫টি গ্রাম পুরোপুরি নোনাপানিতে তলিয়ে যায়। ঘরবাড়ি ও পেশা হারিয়ে উপদ্রুত এলাকা থেকে বাস্তুহারা হয়ে পড়ে দুই লাখ ৯৭ হাজার মানুষ।

২০০৯ সালের ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আইলা আঘাত হানে। এর চার দিন আগে ২১ মে উত্তর ভারত মহাসাগরে এই ঘূর্ণিঝড়টির জন্ম হয়। আর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ২৫ মে আঘাত হানে। আইলা খুলনা ও সাতক্ষীরার উপকূলীয় উপজেলা ছাড়াও পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালীর হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি করে। সরকারি হিসাবে, আইলায় খুলনা জেলার দাকোপ ও কয়রা উপজেলার প্রায় ১৫ হাজার মানুষ বিভিন্ন বেড়িবাঁধে ঝুপড়ি (তাঁবুর মতো ঘর) বেঁধে ঠাঁই নেয়।

২০০৯-র পরে আগত ঘূর্ণিঝড় গুলি যেমন মহসেন, বুলবুল বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় আঘাত করেনি; এমনকি ২০২০-র ২০ মে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান (উমপুন) এবং ২০২১-র ২৬ মে ইয়াশ-এরও সামান্য আঁচড় পড়ে; এর মূল আঘাতটি ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা রাজ্যে। আম্ফান ও ইয়াশে দাকোপ উপজেলায় কোন ক্ষতি না হলেও খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা এবং সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলার একাধিক জায়গায় বাঁধ ভেঙ্গে ব্যাপক এলাকা পানিবন্দী হয়ে পড়ে। এসব এলাকা হতেও মানুষ স্থানত্যাগ করছে। তবে কেউ কেউ আবারও এলাকায় ফিরে এসেছে।

মাইগ্রেশন, ডিসপ্লেসমেন্ট, না-কি এনভায়রনমেন্টাল মাইগ্রেন্ট

ইংরেজি মাইগ্রেশন শব্দটির বাংলা অর্থ এক স্থান বা দেশ বা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্য স্থান, দেশ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন (বাংলা একাডেমি, ইংরেজি বাংলা অভিধান; পৃং ৪৭৬, ফেব্রুয়ারি ২০০৯)। একে এক কথায় স্থানান্তর বলা যায়। ডিসপ্লেসমেন্ট শব্দটির বাংলা অর্থ স্থানচ্যুতি বা স্থানচ্যুতকরণ (প্রগুক্ত, পৃং ২১৭)। মানুষের স্থানান্তর বা হিউম্যান মাইগ্রেশন কথাটি প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়া বলছে, এর দ্বারা মানুষের এক স্থান হতে অন্য স্থানে গিয়ে সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে বসবাস বোঝায়। স্থানান্তরের

এই বিষয়টি এক দেশ হতে অন্য দেশে হয়ে থাকে; তবে দেশের মধ্যেও স্থানান্তর বা মাইগ্রেশন হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ভালো সুযোগ-সুবিধার আশায় মাইগ্রেশন হয়ে থাকে[১]। ডিসপ্লেসমেন্ট শব্দটি মূলত জ্যামিতিতে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে উদ্ভূত, যা এখন নানা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আলোচনাতেও ডিসপ্লেসমেন্ট শব্দটি স্থানান্তর বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বোধ করি এর জন্যে যুতসই শব্দটি হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল মাইগ্রেন্ট। উইকিপিডিয়া এই শব্দ-যুগলের ব্যাখ্যায় বলেছে, আচমকা ও ধীরগতির পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যেতে বাধ্য হওয়া[২]। আলোচনাটিতে যেসব মানুষের স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে, তারা পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণেই চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তাই তাঁরা এনভায়রনমেন্টাল মাইগ্রেন্ট।

নীতি নির্ধারণীরা কি ভাবছেন

সাধারণভাবে এখনও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের মানুষেরা স্থানান্তর বা মাইগ্রেশন বিষয়টিকে স্বীকার করতে চান না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য-উপাত্ত নেই। এ বিষয়ে খোঁজ-খবর বা অনুসন্ধান করাটাকেও সহজভাবে দেখা হয় না। সব-কিছুতেই কেমন যেন একটি লুকোছাপাভাব। তবে সত্যিটা হচ্ছে, দুর্যোগে-দুর্ভোগে নিরুপায় মানুষগুলো এলাকা ছাড়ছেন। যাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ যে জায়গাটি তার জন্যে সহজ বিবেচনা করছেন, বিশেষত আয় ও অবস্থানের দিক দিয়ে সুবিধাজনক স্থানকেই স্থায়ী বসবাসের জন্য মানুষ বিবেচনা করছেন। তবে, ক্লাইমেট মাইগ্রেন্ট-এর বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ আয়োজিত বৈঠকসমূহে আলোচিত হয়। দুনিয়া জুড়ে ক্লাইমেট রিফিউজি বা মাইগ্রেন্ট বিষয়টি আলোচিত, চর্চিত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং বৈশ্বিক সভায় এ নিয়ে তিনি কথাও বলেছেন। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন,

'নদীভাঙ্গন, ভূমিধ্বস, ভূমিক্ষয়, বনধ্বংস প্রভৃতি কারণে দশ লক্ষাধিক মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। তারা আমাদের জনবহুল শহরগুলিতে ভীড় করছে। চিন্তার বিষয় হল যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে আমাদের মোট আয়তনের ১৮ শতাংশ ভূমি তলিয়ে যাবে, যেখানে দেশের মোট জনসংখ্যার এগারো শতাংশ মানুষ বসবাস করে।' ("River bank erosion, landslides, soil degradationand deforestation are causing millions of climate change refugees," the Prime Minister said. "They are already all over our thickly populated cities. What is alarming being that a metre-rise in sea level would inundate 18 per cent of our land mass, directly impacting 11 per cent of our people.")

তবে, এটিও ঠিক যে, জলবায়ু উদ্বাস্তু বা পরিবেশ বিপর্যয়গত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলোর পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা কার্যক্রম নেই। অবশ্য, সরকারি পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি মানিয়ে নেওয়া (অ্যাডাপ্টেশন) এবং ক্ষতিপূরণ (মিটিগেশন)-এর প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক সহায়তায় বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড-জিসিএফ-এর সহায়তায় মিটিগেশন-এর আওতায় –

- 'বস্ত্র ও রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি)-এর বেসরকারি খাতে এনার্জি সেভিং টেকনোলজি ও ইকুইপমেন্ট ব্যবহার উৎসাহিতকরণ (Promoting private sector investment through large scale adaptation of energy saving technologies and equipment for Textile and Readymade Garment (RMG) sectors of Bangladesh).

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড-জিসিএফ-এর সহায়তায় অ্যাডাপ্টেশন-এর আওতায় –

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহনশীলতা বৃদ্ধি (এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-ফ্লাড (ইসিসিসিপি-ফ্লাড);
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট নোনার সাথে উপকূলীয় জনগোষ্ঠী বিশেষত: নারীদের বসবাসের সক্ষমতা বৃদ্ধি (Enhancing adaptive capacities of coastal communities, especially women, to cope with climate change indused salinity);
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম অবকাঠামো তৈরি (Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRIEM).

এছাড়াও বেসরকারি সংগঠনগুলো (এনজিও) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানুষকে খাপ খাইয়ে নিতে ছোট ছোট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। অন্যদিকে, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ছাড়াও নদীভাঙন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দুর্যোগ। প্রতিবছর প্রায় ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ হেক্টর জমি নদীভাঙনে হারিয়ে যায়। এতে প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রতিবছর ২৫ কোটি ডলার[৪] আর ভিটে-মাটি হারানো মানুষেরা শহরমুখী হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন শুরু করতে বাধ্য হয়। বর্তমানে সরকারি অর্থায়নেও বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে; তবুও দু:খজনক হলেও সত্যি, পরিবেশগত বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনে পরিকল্পিত কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি।

পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে মানুষ উদ্বাস্তু হচ্ছে বলা হলেও দেশান্তরী হওয়ার বিষয়টি সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় না। কর্মসংস্থান ও অন্যান্য সুযোগের কারণে মানুষ উন্নত দেশগুলোয় যায়, সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসও করে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতে বিশেষত: বাংলাদেশ সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় বাংলাদেশের মানুষের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে, কেউ কেউ সেখানেও যান। তবে ১৯৪৭ উত্তর কাল হতে এটি একটি রাজনৈতিক ইস্যু। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ গঠিত হওয়ার পর পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) হতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেকেই ভারতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। স্বাধীন বাংলাদেশ হতে ভারতে কেউ যায়, তা স্বীকার করা হয় না। অবশ্য, ভারত সরকার অনুপ্রবেশকারী তকমা দিয়ে বাংলাভাষীদের পুশব্যাক করানোর মত অমানবিক পদক্ষেপও অতীতে গ্রহণ করেছে। যাতে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক বিতর্কও হয়েছে। যেহেতু ১৯৪৭-উত্তর কাল হতে এই দেশান্তরী হওয়াটি একটি রাজনৈতিক ইস্যু, তাই এটি পরিবেশগত ইস্যু হিসেবে কখনও আলোচনায় আসেনি।

দেশের অভ্যন্তরেও যে মানুষগুলো এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, তারা ভয়াবহ আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। নিজস্ব ঠিকানা হারিয়ে মানুষগুলো একপ্রকার ঠিকানাহীন হয়ে পড়েন। সম্পদ ও জীবিকা সংস্থান -দুটোরই ক্ষতি হয়। এতে বিপর্যস্ত মানুষগুলোর জীবিকার সংগ্রাম তথা টিকে থাকার সংগ্রাম প্রধান হয়ে ওঠে। এই দুর্গম পথে চলতে গিয়ে অনেকেই বিপথগামী হন, নারীরা হেনস্থা ও বিপর্যয়ের কবলে পড়েন, আবার অনেককেই বারেবারে স্থান বদল করতে হয়। স্থানান্তরের যে ছবিটি আমরা আগে বর্ণনা করেছি, তাতেও দেখা যায়, অনেকেই কাজের সুযোগ থাকায় দেশের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হতে একেবারে দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়ি অঞ্চল – রাঙ্গামাটিতে গিয়েছেন। আবার কেউ কেউ ভারতে গিয়েছেন, সেখানে কেউ কেউ আছেন; আবার অনেকে ফিরেও এসেছেন। এই টানাপোড়েন প্রধানত বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

শেষের কথা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দুনিয়াব্যাপী আবহাওয়ার খামখেয়ালী রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। কয়েকদিন আগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একদিকে আগুন এবং অন্যদিকে বন্যার ভয়াবহ রূপ আমরা দেখলাম। জার্মানিতে বন্যা, অস্ট্রেলিয়ায় ও গ্রীসে দাবানল প্রভৃতির জন্যে জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করা হচ্ছে। অবশ্য, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপকূলের দেশগুলোতে ঝড়, বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব বরাবরই বিদ্যমান। ধনী উন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত কার্বন নি:সরণজনিত কারণে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়ছে, উত্তরের বরফ গলছে, সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে, আগের চেয়ে

অনেক বেশী ঘূর্ণিঝড় তৈরি হচ্ছে। উপকূলীয় দেশগুলো সমুদ্রস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে উপকূলের অনেক এলাকা ধীরে ধীরে ডুবে যাবে। আর, বিপুল সংখ্যায় মানুষ সম্পদ, বাসস্থান ও কাজ হারিয়ে উদ্বাস্তু হচ্ছে, হবে।

এই উদ্বাস্তু মানুষগুলোর দায় কে নেবে? এটা কি শুধুমাত্রই ভুক্তভোগী দেশ/দেশগুলোর সমস্যা, না-কি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যে যে দেশগুলো দায়ী, তারাই আসল দোষী। যদি তাই হয়, তবে ওই দেশগুলোর উপরই এই জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়ও বর্তায়। অবশ্য, ধনী-উন্নত দেশগুলো এই দায় এড়িয়ে জলবায়ু দুর্যোগকে মানিয়ে নিতে বা দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা তৈরিতে ঋণ দিতে শুরু করেছে। যা আর এক ধরনের বিনিয়োগ! জলবায়ু-দুর্যোগকে নিয়েও ব্যবসা শুরু হয়েছে।

ছবিঋণঃ লেখক। লেখার ভিতরের ছবিগুলি ২০২১ সালের ১৬ই আগস্ট ও ২০শে আগস্ট তোলা হয়েছে।

ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা:

ইউনিয়ন পরিষদ: কয়েকটি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত। স্থানীয় পর্যায়ের সর্বনিম্ন নির্বাচিত ইউনিট। ইউনিয়ন পরিষদে এলাকাবাসী ভোট দিয়ে একজন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য (৯টি ওয়ার্ড, ইউনিয়নকে ৯টি অংশে বিভক্ত করা, যার এক একটিকে ওয়ার্ড বলা হয়) এবং সংরক্ষিত তিনটি নারী সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন।

উপজেলা: এটি প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর। কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে উপজেলা গঠিত। এর প্রশাসনিক প্রধান উপজেলা নির্বাহী অফিসার। এলাকাবাসীর ভোটে নির্বাচিত হন একজন উপজেলা চেয়ারম্যান, দু'জন ভাইস-চেয়ারম্যান। এটি অনেকটা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ব্লক-এর মতো।

তথ্যসূত্র

*****

Dushkal: A Study in Climate Change Risk Perception from The Fields of Gujarat

Dr. Nairwita Bandyopadhyay

Cover Credit : Internet Stock Photos

"*Every field has a Eucalyptus tree. If it over blooms, it is indicative of the fact that there will be sufficient rainfall*", a farmer in Kothasanamota, in his 60s, explained.

"Similarly, by watching the small black '*chakli*' (Indian Robin/sparrow), we can estimate the occurrence of drought. If their black colour turns blue, it means drought is coming. Changing colours is common in chaklis, especially during impending droughts. Also, if they sit on empty branches, it is believed to be a drought year."

Droughts are initiated due to changes in precipitation patterns and a reduction in the precipitation amount, resulting in a sudden and acute deficiency of soil moisture as well as surface-water and groundwater resources. However, this is more of a generalised description. In practice, droughts are a protean phenomenon. They manifest a number of conflicting characteristics that resist any attempt to reduce them to a singular category. For instance, meteorological drought is a result of inadequate rainfall and the deficiency of soil moisture which, in turn, leads to vegetative drought. When this influences the groundwater level and the minimum availability of groundwater reaches below average level, it leads to hydrological drought. Intense, continuous, or frequent meteorological and hydrological droughts cut the supply of moisture to plants, leading to vegetative and agricultural droughts. Recurrent agricultural droughts not only cause huge economic loss for the country but also flare up the price of food grains and other essential goods and commodities, triggering mass migration, poverty, exploitation of women and suicide. All of these result in a vicious cycle of damage to every sphere of life.

In this context, risk perception influences the mitigation of the problem. Faulty perception could result in time and money wasted in mitigation and preparation of a risk that threatens them to a greater degree. People respond to the way they process

the information about a hazard. Often, it has been observed that a flawed perception can lead to untimely reactions leading to greater loss.

A period of water scarcity assumes a new meaning for farmers of different villages of Gujarat, though chiefly identified in local language as '***Dushkal***' or '***Dukal***'. This blanket term perhaps encompasses what a drought may mean for these farmers, a 'bad' time, a period of infertility and dearth.

In this article, we will be looking at how people respond to the changing climate particularly in an agriculture-based state such as Gujarat, in the northern districts which are hit by droughts every 3-5 years in a 10-year period. Narratives collected from people in the course of field research helped us explore the range of responses to scarcity situations and the changing nature of water resources in nine villages of Gujarat. The different villages were:

- Upalagoda in Amirgadh Taluka of Banaskantha
- Kothasanamota of Satlasana Taluka in semi-arid Mehsana
- Nanakantharia and Laxmanpura in semi-arid Bhiloda Taluka of Sabarkantha
- Idata in arid Tharad
- Lodhrani in arid Vav in Banaskantha district
- Lodai,Berdo and Dhrang in the severely arid Kutch

All these study areas were highly drought-prone, where temperature and rainfall played a major factor, contributing to regular occurrences of drought and depleting the underground water table. Kutch also suffered from problems arising out of salinization.

Narratives From the Field:

Rooted in the traditions of the region, women in Gujarat do not speak up in front of elderly men. So, when we approached them, the women of the village were surprised to find that they were also being interviewed for the study, that their opinions were important and would have some influence on our research or, at a higher level, even policy-making.

For the purpose of this study, we interviewed a number of farmers from the region. Qualitative, **in-depth interviews** typically are much more like conversations than formal events with predetermined response categories. The researcher explores a few general topics to help uncover the participant's views but otherwise respects how the participant frames and structures the responses. The interviews session with the people of the village helped us gain a lot of information about their lifestyle, their response to drought and their mitigation strategies. A thorough **group discussion** was held with the *patwari*, *mamlatdar* and the teacher of the village and this helped us rope in a lot of information about the village. They gave us a lot of extra information about the programmes and policies run by the government and also the impact of the drought on the lives of the people.

Our field study was based on an analysis of the interviews of both male and female respondents during group discussions. The interview was based on the principles of confidentiality and anonymity and only one interpreter was present as the language was alien to the researcher. Gender became the key variable in our interviews in that we approached men and women differently. The idea was also that the experiences and perceptions of women would be different from those of men and that they may not feel comfortable in sharing their versions in front of men. The decision to interview men and women separately was thus taken also keeping in view that such isolations may encourage women to speak.

Perception About Climate Change: Meaning, Identification, Causes And Occurrence

According to Paul Slovic, Baruach Fischhoff and Sarah Lichtenstein, "People respond to the hazard they perceive." Thus, people do not respond to hazards that they do not perceive. Since risk is a possibility, its parameters are defined by the guesswork or the perception of risk by the individual. Overcoming the factor of risk depends upon how well the individual or group evaluates the possibilities and predicts the consequences of the negative outcome.

Giving The Hazard A Name:

Different farmers defined 'drought' differently. For farmers of Kothasanamota in Mehsana, the **lack of rainfall or the excess of it, both signify drought**. "Drought, to us, means a lack of rainfall as well as an excess of it. In both cases we suffer crop loss. If there is excess rain and crop loss because of it, we call it ***green drought***," a local farmer from among a group of about 20, explained. This is an instance of meteorological drought leading to vegetative drought.

In Lodai village in Kutch, people like to keep things simple. “If there is no water, then there is drought. If there is water in the well, we know that there is no drought,” explained a farmer. This is an instance of hydrological drought.

“*Rainfall is in the hands of almighty*,” an old farmer in Sabarkantha’s Nanakantharia village declared. “If there is no rainfall, there is drought. If there is rainfall, there is no drought.” Overhearing the discussion from a few metres away, a middle-aged mother of two put in her take: “Drought is when there is a heat wave.” This is another instance of a meteorological drought. A few more female farmers of the village elaborated on what they perceived as drought. “When there is less water for drinking and irrigation in bore wells and hand pumps, we get to know that there will be a drought”. This, again, is a hydrological drought.

Photo Showing People Digging The Soil In Search Of Water At Kutch

Identification

Much like the meaning of drought, its identification, too, has various parameters, relying heavily on villagers' accrued knowledge through the years.

The prognosis of drought can be made through a host of **traditional hints such as the state of the trees, the direction of the wind, animal mannerisms,** and the like.

Another potential indicator of drought is the water level of the wells, farmers said. "Water can be found till 115 feet, beyond which there is granite, which doesn't let water percolate. The water level has gone down some 300-400 metres in the last 25 years. Before that, the drop in level used to be 20-25 metres. Off late, the level is dropping 20-25 metres every year, and if this continues, it will create problem for drinking, irrigation and everything related to it. Typically, if the well is 120-125 feet deep, only then there is water in the current scenario," a local farmer observed.

A woman who has been living in Nanakantharia village of Sabarkantha for almost 22 years now, since her marriage recalled that there was severe drought after 1992. Drought is when there is a heat wave, when the "paan" trees shed their leaves", we know there will be a drought in 15-20 days. An old man in the same village added, "The trees shed their leaves, we can understand". Another woman in the same village had a different view. According to her, it was easy to tell a drought year after a moist spell in the previous year, but in case of consecutive dry years, it was not easy to localise the drought.

She said, "How will we know if there's going to be a drought? If it stretches across two consecutive years, we can hardly differentiate between a drought year and a regular one, as it is almost the same as last year.

We can only tell it apart when there is a period of dry spell after a moist year. All the livestock died, 25 years ago – we could not understand that it will be a drought that year."

In all the villages that were surveyed, there was this consensus that the climate had changed but there was limited understanding as to why it had changed. The common refrain was: '*Prakruti ki baathai*'. They mostly held nature responsible for all their misfortune.

Photo Showing Girls Carrying Water For Household From The Canal Where Water Is Available

Perceiving The Causes:

Responding to questions, the majority of the farmers and local people pointed at a scarcity of water both for drinking and for agriculture; a fall in the depth of water in the wells, the loss of crops, and unemployment as indicators of the onset of drought.

For the people of Laxmanpura, the over-extraction of water by rich farmers following the Green Revolution is what probably caused the depletion of the ground

water table. According to one of the farmers, “Previously, there used to be a well which had water throughout the year even in severe dry conditions. It was used later for irrigating the crops during drought season fearing crop losses”. It was made even more deep by the rich people.

“There was only 50 ft-60 ft water in that well then, so they (the rich people of the village) made it deeper. They used to have jobs, they had money, so they made it deeper. We knew that once it became deeper, there woukd be more extraction and ultimately no water would be left for consumption.”

According to another farmer, lower rainfall is the reason for the shortage of water. Some attributed it to the increased use of water in agriculture which was never the case earlier. Water was only used for drinking and household purposes. “There is more use in agriculture now. Earlier, no one used to practise agriculture, there was no water for drinking either, now they need water for agriculture.”

In Mehsana, the use of ground water in agriculture was possible only after the village got an electricity connection. According to an old farmer, rich people are extracting more groundwater now, leaving the poor farmers vulnerable and affecting the groundwater levels. He said, “In the past, they procured drinking water from hand pumps. Now more water is used for agriculture because of this two-phase electricity.” The two-phase electricity helps them power the pumps, which, in turn, extracts ground water. There is no control of its use. Those who have money extract as much water as they can since they can pay for the electricity or buy diesel driven pumps. Water levels have gone down because of that. There is very little drinking water and not much water for irrigation left for the people.

Deforestation was cited as another reason for such changes in weather conditions. Forests aid in precipitation. They have cut down forests. There is no industry around yet, deforestation does affect the situation. The farmers say bleakly, "*asar to padta hai*." There are very few trees left now. Every villager is responsible for this. If someone protests, no one cooperates with them, no one joins them in the protest. The person felling the tree doesn't pay heed to the protest. The government, nonetheless, has taken some initiative to plant new saplings. But the fact remains that people are felling trees recklessly right in front of the villagers who hardly raise a voice.

Droughts Of the Past

The way the villagers experienced the drought and the way it impacted their lives varied from area to area and the occurrence and intensity of droughts were not the same across all the study areas owing to their differing geographical settings. Their experiences varied according to age, class, caste, gender and their socio-economic position in the society which made them either very vulnerable or less so in coping with droughts.

In Palanpur, according to the knowledge and the experiences of the locals, drought was observed or experienced by them in the years 1978, 1943 and in 1956**.** According to one of the participants, drought was observed 35 years earlier when no crops could be grown and all of their livestock died. The villagers went out of the village, some 50-60 kms beyond its borders to work as labourers for at least 6-8 months. They used to bring food back to their families, feed them after coming home from work every two or three days. Then they used to go back again.

Another participant, aged approximately 60 to 65 years, mentioned a drought in 1943. He also recalled that in his lifetime (he was 75 years old now), he had seen

6 to 7 separate drought occurrences. In those periods, they sold dry wood, livestock and bamboo at 10 paisa per piece to Palanpur. But according to him, drought years wouldn't follow each other the way they do now. There would be years with adequate rainfall in between.

In 1956, as another villager recalled, over 200 cows, goats and buffaloes were killed by a drought. There was only one well beside the river which had not dried up. Otherwise everything had dried up.

In the village of Laxmanpura, the memory of the droughts of 1987 and 2005 is still very fresh. A woman recalled, "Everyone remembers the drought of 1987 when all our livestock died and men migrated to other areas". Ten years ago, in 2005 there was a drought event that was also very bad. When I married into this village, I discovered that there was no water for everyday use, no water for irrigation."

According to the villagers in VAV Taluka, there was drought-like situation in the year of 2011. In the year of the "All India Drought" (1999), the situation was alright. In 2009, another drought year, there was some problem in a few fields, but in 2011 it had spread across the whole village. The government had finally had to officially declare drought.

In 2002, in a village called Lodai in Kutch, there were drought-like conditions for the crops, an instance of vegetative drought, but there was not much problem in obtaining drinking water. This was despite the fact that there were conditions of scarcity in agriculture.

The villagers of Idata in the Tharad Taluka remembered that there had been a drought in 1998-1999. *The validation of the findings from remote sensing data showed that the years which the villagers could identify as drought years, were*

successfully picked up by the PDN drought index, which showed that the study areas had actually been severely affected by the drought. Thus, there is a strong correlation between perceived drought and actual, scientific evidence thereof. There were many other drought years which the villagers could not identify as that, such as the droughts of 1991 and 1993 in Kutch. This may have happened because they could not specify the drought year as one or because its impact was not that great as the surrounding areas were not affected by the drought and it was only a local phenomenon. The memories of the severity of the droughts of 1987, 2001, 2002, 2005 and 2011 correctly matched the drought index findings.

Change In Temperature:

According to the farmers of Mehsana in Banaskantha, the average temperature has increased over the last 5 years. Loo blows frequently. In Lodai, Kutch it was observed that the temperature has increased excessively in the last 3 years. They also mentioned that the nights have grown much colder in tandem with the rise in temperatures in the daytime. In Nanakantharia, it was reported in a meeting with the villagers that the *temperature has not only increased during the day, but that the night temperature has also dropped compared to what it was a few years ago making the nights very cold.* From this they could sense that it would be hot during the day. They also observed that frequent heat waves impacted the crops even in the vicinity of water. The dominant perception is that if there is water, crops will survive in spite of extreme temperature fluctuations. According to an old man in Laxmanpura, the atmosphere gets warm much quicker than before. The impact of this increase in temperature is detrimental to the farmers working in the fields for long hours in the summer. According to a woman farmer in Nanakantharia, “The temperature will rise above the average in April, when we have to work in the fields. It has increased over the last 5-6 years.”

Drawing A Conclusion:

The perception of drought is embedded in the way a villager in the study area understands and identifies it. Their perception to change in climate characteristics and impacts highlighted how the climate has changed in the last decade and how they have learnt to adapt to traditional agricultural methods. This is due to lack of awareness, non-belief in forecasting, mistrust and illiteracy which has led to weakening linkages between farmers and agriculture research community in the state. Impact of a drought and their response were dependent on the social and economic status of the people which made them either more vulnerable or less vulnerable to the same situation. Numerous government agencies that issue early warnings and other forecasts have been unable to furnish accurate and timely drought-related information to farmers in remote villages. Contingency plans in the event of a drought were found wanting, and whatever little detail on droughts was provided, lacked specific guidelines on how to cope with it.

In the end, villagers, abandoned by the establishment and agencies that are supposed to bear the burden of "scientific knowledge" fall back on their own mechanisms, devised through years of experiential knowledge and an acutely mastered ability to listen to the reports of nature. Yet, there is a disorderly unease and above all, a sense of isolation in their perception of the natural disasters in their wake in the absence of a systematic framework and robust governance. And that is what forms the true tragedy of this narrative.

Inline Photo Credits: Author

*****

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ দক্ষিণবঙ্গের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আম্ফান : স্বাগতা বোস

২০০৯ সালে আয়লা ভেঙে দিয়েছিল সুন্দরবনের মানুষ অধ্যুষিত দ্বীপের বাঁধ সমূহ। অন্যদিকে, জন-বহুল দ্বীপের দিকে না এসে, কেবল অরণ্যের উপর দিয়েই বাংলাদেশ চলে গিয়েছিল ২০১৯-এর বুলবুল। তাতে সমূহ ক্ষতি হয়েছিল জি প্লট, সাগরদ্বীপের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, মেদিনীপুরের একাংশর।

এখানে আয়লা এবং বুলবুলের করা ক্ষতির তুলনা করা হচ্ছেনা। বরঞ্চ, দুই বজ্রঝড়ের চারিত্রিক তুলনার মাধ্যমে সমগোত্রীয় ঝঞ্ঝা সম্পর্কে সামান্য ধারণা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।

আয়লার তান্ডব শুরু হয়েছিল ২৩শে মে, ২০০৯। এটা ছিল প্রাক মৌসুমী ঝঞ্ঝা। এ সময়ে বাতাসের জলীয় ঘনত্ব বেশি থাকে। তাই ঝড়ের মোমেণ্টাম বা ভরবেগও প্রভূত হয়। বুলবুলের তারিখ ছিল ১লা নভেম্বর, ২০১৯; এর গতিবেগ আয়লার চেয়ে বেশি হলেও বর্ষা পরবর্তী সময়ে বাতাসের জলীয় ঘনত্ব তুলনামূলক কম হওয়ায় সম্মিলিত ভরবেগ কম ছিল। এখানে আর একটা দিক দেখা জরুরী; ঘটনাটা মরা কোটালে বা ভাটায় ঘটছে না ভরা কোটালে বা জোয়ারে ঘটছে। ভরা কোটালে ঘটলে ঢেউয়ের উচ্চতা দশ ফুট অবধি বেড়ে যেতে পারে।

বুলবুলের ক্ষতি সামলে উঠতেই, ছ' মাসের ব্যবধানে চলে এল আমফান ও তার এক বছর পরেই ইয়স। আমফান-ও প্রাক মৌসুমী বা প্রাক বর্ষাঋতু ঝঞ্ঝা। এর গতি ছিল বুলবুলের থেকে বেশি ও জলীয় ঘনত্ব আয়লার সমান, কারণ আয়লা ও আমফান দুটোই বছরের প্রায় একই সময় সূচিত হয়েছিল। তাই মিলিত ভরবেগ বিগত দুটি ঝঞ্ঝার থেকেই বেশি। ঝড়ের চোখ যখন পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলে পৌঁছয় তখন প্রায় ৫০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে এর দাপট আছড়ে পড়ে আশেপাশের সমস্ত এলাকায়। ঝড়ের চোখের গতিপথের ভবিষ্যদ্বাণী বহু বিষয়ে নির্ভরশীল ও অত্যন্ত জটিল এক বিজ্ঞান, যার মূলে আছে তাপগতিবিদ্যা বা থার্মোডায়নামিক্স। বর্তমান প্রযুক্তিতে উপগ্রহর ছবি ও তথ্য প্রাপ্তির জন্য এই প্রেডিক্শান বা ভবিষ্যত ঘোষণা অনেকটা সহজ হলেও কখনোই সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারেনা। সৌভাগ্যক্রমে, আমফানের সময় নির্ধারণে এই প্রেডিকসান প্রায় নির্ভুল হয়েছিল। যে সময় ধরে ঝঞ্ঝার চোখ ধীরে ধীরে সাগর উপকূল পেরিয়ে কলকাতার দিকে আসছিল সেই পুরো সময়টাই পঞ্চাশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধর সমগ্র এলাকায় চলছিল ১২০ কিমি-১৭০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতি বেগের তুফান। তাপগতিবিদ্যার নিরিখে, এটাই ঝঞ্ঝার চরিত্র। আবহবিদদের প্রায় নির্ভুল প্রেডিকসান সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলির একাংশকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো যায়নি। কলকাতা ও শহরতলির ক্ষতি এবং উপকূলবর্তী এলাকার ক্ষয়ক্ষতি একেবারে ভিন্ন মাত্রার ও ভিন্ন বৈজ্ঞানিক আঙ্গিকের।

শহরতলিতে ঝঞ্ঝার আগে ও পরে কী কী করণীয় তা অনেকটাই প্রথাগত দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণের সাধারণ পাঠের অংশ; এর রূপরেখা তৈরির জন্য আমাদের কাছে বিভিন্ন উন্নত সমাজের নকশা বা প্রতিমানের সাথে আমরা পরিচিত। কিন্তু উপকূলবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আঙ্গিকে এই রূপরেখা তৈরি করা দরকার অবিলম্বে। এই রূপরেখার মূলত দুটি ভাগ। প্রথমত, ঝঞ্ঝার পরে ও দ্বিতীয়ত, ঝঞ্ঝার আগে।

ঝঞ্ঝা-পরবর্তী করণীয় তালিকা শুরু হওয়া উচিত ঝঞ্ঝা ঘোষিত হবার দিন থেকে। আধুনিক যুগে অন্তত চার থেকে সাত দিন সময় পাওয়া যায়। এই তালিকা ক্রমশ দীর্ঘায়িত ও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে এবং ভবিষ্যতে তা অসম্ভবে পরিণত হতে চলেছে।

করণীয়র মধ্যে পড়ে:

প্রথমত, মানুষ, গবাদি পশু ও খাদ্য সম্ভার স্থানান্তরিত করা। এই প্রথম কাজটিই করা সম্ভবপর হয়ে উঠছেনা। সুন্দরবন ও সংলগ্ন উপকূলবর্তী অনেকাংশের অর্থনীতি আংশিক ভাবে স্ব-নির্ভর বা পারশিয়ালি সাবসিসটেন্ট অর্থাৎ তারা উৎপন্ন খাদ্যশস্যের অনেকটা নিজেদের জমিতে মজুত রাখে। গবাদি পশুও তাদের বাসস্থানের মধ্যেই থাকে। এই পুরো লটবহর নিয়ে স্থানান্তর প্রায় অসম্ভব। তাই এই স্ব-নির্ভর অর্থনীতির একটা যথাযথ বিকল্প দেওয়াই একমাত্র কর্তব্য, যা ঝঞ্ঝা পরবর্তী করণীয়র তালিকা থেকে প্রাক-ঝঞ্ঝা করণীয়র তালিকায় চলে যায়।

দ্বিতীয়ত, স্থানান্তর যেসব আশ্রয়স্থলে করা হবে সেখানে পর্যাপ্ত খাদ্য, পানীয়, ওষুধ, ব্যবহার্য জল ও ডিজেল চালিত জেনরেটরের ব্যবস্থা রাখা। গণ খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং এই ব্যবস্থা অন্তত পনের দিন থেকে এক মাস কার্যকরী রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়ত, যে সব সামাজিক ত্রাণ বা সাহায্য আসবে তার সুষ্ঠু পরিচালনার ভার এই সব এক একটি আশ্রয়স্থলের আধিকারিকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া।গ্রামের যেটুকু স্বাস্থ্য পরিষেবা আছে তা আধিকারিকদের নিয়ন্ত্রণে আনা। বিডিও অফিসের যা ক্ষমতা তা এমন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া এবং আধিকারিক নির্বাচনে পঞ্চায়েতকে স্থানীয় সরকারি আধিকারিকদের মেনে চলতে বলার বাধ্যতার নিশ্চিতায়ন; এটিকে দুর্যোগকালীন আইনের আওতায় আনা।

চতুর্থত, গ্রামের মানুষদের মধ্যেই পুনর্নির্মাণের কাজের জন্য বরাদ্দ সরকারি অনুদান ভাগ করে দেওয়া। বাঁধ নির্মানের অর্ধেক কাজ এভাবেই হতে পারে এবং সাধারণ মানুষই এতদিন করে এসেছে। কিন্তু নিজস্ব এলাকায় কাজ করার সময়ে সকলে যদি অঞ্চলকেন্দ্রিক মূল্যায়নে চালিত হয় তখন সেটা বিজ্ঞান ভিত্তিক কখনোই হবেনা এবং এর জন্য সাংগঠনিক স্তরে একটা নিয়মাবলীর আশু প্রয়োজন। এরকম একটা মডেলে কাজ করে ব্যক্তিগত স্তরে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছেন প্রাক্তন রাজনীতিবিদ ও আজকের পরিবেশপ্রেমী কান্তি গাঙ্গুলী।

বিঃদ্রঃ- রায়দিঘিতে আমফানের পর এই পুনর্নির্মাণ ভবিষ্যতে কান্তি মডেল হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ঝঞ্ঝা-পূর্ব করণীয়র তালিকা তৈরি করতে গেলে প্রতি বছরের তালিকা যোগ করে একটা পাঁচ বছরের সম্মিলিত করণীয় তালিকা তৈরি করা জরুরি।

প্রথম কাজ — বাদাবনের (ম্যাংগ্রোভ) সমৃদ্ধি। শোনা যায়, ঝঞ্ঝার চোখ বা আই অফ স্টর্ম বাদাবন ঘুরিয়ে দেয়। এটা খুব একটা ভুল নয়। বস্তুত যে কোনো অরণ্যই জনপদকে ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে বাঁচাত সক্ষম। সমুদ্রোপকূলবর্তী নোনা জলে বাঁচতে পারে একমাত্র ব্রাকিশ ম্যানগ্রোভ বা নোনা জলের বাদাবন। সুন্দরবন অঞ্চলের বাদাবন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা ঝড় প্রশমন ক্ষমতার উপর গবেষণা মূলক কাজ এখনো অবধি সুচারুভাবে শুরু করা হয়নি। বাদাবনের ওপর এই গবেষণা বঙ্গীয় উপসাগরের আসন্ন বিপদ কে মন্দীভূত করতে পারে। তবে যদি মনে করা হয় যে হল্যাণ্ডের মত উন্নত মানের বাঁধ তৈরি করে সুন্দরবনের পঞ্চাশের ওপর দ্বীপের অসংখ্য মানুষকে অনায়াসে বাঁচানো সম্ভব, তাহলে এই ধারণা ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্রায়ই শোনা যায়, যে সরকার বাদাবন রোপণ করার উদ্যোগ নিচ্ছে। এমনটা ভাবা হয় যে সুন্দরবনের বাদাবন লবণাক্ত জল ছাড়া বাঁচে না। এটা সম্পূর্ণ রূপে সত্য নয়। সুন্দরবন অরণ্য মিষ্টি জল চায়। যে কোনও ঘন অরণ্যই ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে বিপদমুক্তি ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু সমুদ্র সংলগ্ন এলাকায় যে কোনও উদ্ভিদ বাঁচতে পারেনা। তাই সুন্দরবনের লোনাজলের বাদাবন এত বিশিষ্ট। এরা লবণাক্ত জলে বেঁচে থাকার ক্ষমতা সম্পন্ন। সমুদ্রের জল থেকে মিষ্টি জল শুষে নিয়ে এরা বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু এই লবণাক্ত জলে বেঁচে থাকার পরেও এদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির জন্য মোহনায় মিষ্টি জলরেখার মিশ্রণ একান্ত প্রয়োজন। মাতলা মিষ্টি জল থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। বিদ্যাধরীর জল ক্ষীণ। ইছামতীর জল অনেকটাই বাংলাদেশে চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গীয় সুন্দরবনের বাদাবন মোহনায় নদীর মিষ্টি জল চায়। অতীতটা কিন্তু/যদিও এরকম ছিল না। হুগলি থেকে এবং বর্ষায় প্লাবিত হয়ে অসংখ্য মিষ্টি জলকণা এসে পড়ত মাতলায়। বিদ্যাধরী ছিল সমৃদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দরবনের বাদাবনের জন্য এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল মাতলা নদীতে মিষ্টি জলের পরিমাণ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। এটা সেরকম কঠিন কোনো কাজ নয়। এটাকে প্রধান এজেণ্ডার মধ্যে আনা কর্তব্য/দরকার। কীভাবে মাতলায় মিষ্টি জল ফেরানো যায় তার মানচিত্রর খসড়াও সুন্দরবন প্রেমীদের কাছে আছে ব্যক্তিগত স্তরে। এই মিষ্টি জলরেখা হুগলি থেকে মাতলায় সংযুক্ত করার যে কর্মোদ্যোগ, তাতে সুন্দরবনের মানুষদের একশোদিনের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। মনে রাখতে হবে যে নৌ-

পথ নির্মাণে ও নৌ-পরিবহন সংক্রান্ত কাজে এই জনজাতি ঐতিহাসিক ভাবে বিশ্ব-সেরার তকমা পেয়ে এসেছে সেই বারো ভুঁইয়ার আমল থেকে।

দ্বিতীয় কাজ — সমুদ্র উপকূলবর্তী এই জনজাতির কর্মদক্ষতার অভিমুখ বদল করার প্রয়াস করা যাতে তারা ক্রমে এই রাজ্য তথা দেশের অন্য এলাকায় থাকার উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। এক কথায় এলাকার জনস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ ও তাদের অপর জায়গায় অভিপ্রয়াণের যোগ্য করে তোলা। অবশ্য এই পদ্ধতি যেন কোনও ভাবেই মরিচঝাঁপির মত অমানবিক না হয়!

তৃতীয় কাজ — দ্বীপসমূহতে ও উপকূলবর্তী এলাকায় কৃত্রিম ভাবে উচ্চভূমি তৈরি করে আবাসন নির্মাণ ও নদী বা জলরেখা থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে জনবসতি অপসারণ করা।

চতুর্থ কাজ — জমির পাট্টার পরিবর্তন করা বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করা। যদি জমি বিক্রয় করতে হয় তো সেটা একমাত্র সরকারকেই করতে হবে, এই আইন প্রণয়ন করা। সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে যাতে এই মানুষজন অরণ্য দফতরের কাছে ভাল দামে নিজেদের জমি বিক্রি করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এই টাকায় পুনর্বাসন সম্ভব হবে ওই পরিবারটির অপর কোনও দূরবর্তী স্থানে।

পঞ্চম কাজ — প্রতি দ্বীপে চাল মজুতের সরকারি পাকা গুদাম তৈরি করা, এবং অতিরিক্ত চাল কিনে নিতে হবে যেন সরকার কিনে নেয়। এই পদ্ধতি আংশিক ভাবে স্ব-নির্ভর বা পারশিয়ালি সাবসিসটেন্ট অর্থনীতির মনন থেকে জনজাতিকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে।

ডাম্পিয়ার-হজের চিহ্ন রেখা অনুসারে ১৮২৯-৩০ সালে সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারিত হয়। উইলিয়াম ডাম্পিয়ার ও আলেকজান্ডার হজ হলেন সেই দুই ব্যক্তি যারা জরিপ করে এই সীমারেখা নির্ধারণ করেছিলেন। দীর্ঘসময় ধরে দ্বীপ সমূহের ভৌগোলিক আয়তন কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে। ১৮৬২ সালে, ৪৫ কিমি দীর্ঘ রেললাইন পাতা হয় অধুনা শেয়ালদা থেকে ক্যানিং বন্দর অবধি। ১৮৫৭ র সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানি তেড়েফুঁড়ে ওঠে ব্যবসায় দ্রুত সাফল্যের জন্য। রেল লাইন পাতার পাশপাশি, হুগলি নদীর নাব্যতা কমে যাবার আশংকায় বিদ্যাধরী ও মাতলার সঙ্গমস্থলে ক্যানিং নদী বন্দর স্থাপিত হয় । এক বিশাল বনাঞ্চল সম্পূর্ণ সাফ করে ফেলা হয়। বিপুল পরিমাণে বাদাবন কেটে ফেলায় সামুদ্রিক ঘূর্ণি ঝড়ে সহজেই আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী ঝঞ্ঝায় (২রা নভেম্বর, ১৮৬৭) ক্যানিং বন্দর সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ক্যানিং-এ যে দিক থেকে বিদ্যাধরীর মিষ্টি জলরেখা আসছিল তা ক্রমশ গেছিল বুজে; তৈরি হয়েছিল নদী বাঁধ; স্থাপিত হয়েছিল বসতি। সময় এসেছে এই হঠকারিতাকে প্রশমিত করার, নচেৎ একদিন এই দক্ষিণ বঙ্গের

ভৌগোলিক সীমারেখা একেবারে বদলে যাবে। বাঙালির শখের কলকাতা ফের ভরে যাবে নোনা জলে আর গড়িয়াতে ফের দেখা যাবে গুড়িয়া প্রজাতির বাদাবন, অথবা এন্টালিতে হেতাল গাছের ঝোপ। এই অঞ্চল গুলোকে সঙ্গে নিয়েই হয়ত প্রকৃতি আবার ফেরত চলে যাবে অতীতের এক নিরাপদ অবস্থানে।

প্রচ্ছদ: স্বাগতা বোস

*****

It’s In The Air: Taking The Human-Atmospheric Relationship Seriously

Vasundhara Bhojvaid

Wheat Fiedl With Cypress - Van Gogh. Picture Courtesy : Wikimedia Commons

I

During a lecture with undergraduate students in late October 2019, I was informed that the university student body president had reached out to university authorities requesting the cancellation of classes due to significant air pollution. The university in question is located in western Uttar Pradesh, at the very tip of the Delhi NCR expanse. This location positions the university campus just beyond the urban conglomerates of Noida and Greater Noida that are within a range of 70 KM from New Delhi. Being a residential university, students need to cover the distance between their hostel rooms and the academic blocks to attend classes, which is possible on foot. It was explained to me that the request had been denied and it did not go down well with most students, as they believed that they were being forced to sit in the dangerous air in my classroom.

This vignette has remained etched in my memory not only because it led to a long conversation in class (steering far from the intended lecture content of the day), but also because I cannot help registering that such a request would have been unfathomable sixteen years ago when I was a young undergraduate student in Delhi University. And yet, no student in my classroom found it the least bit extraordinary to demand suspension of lectures due to *polluted air*. What had happened in the interim short span of 16 years? Let me attempt to sum up the discussion that followed in class by addressing two aspects – what does it mean to live with 'bad air' and what factors led the student body to designate the request as a legitimate ask?

I use the preposition 'with' to designate our relationship to air for two reasons. Firstly, the consciousness of bad air is the realization that we are, in fact, always surrounded by air and that given the current quality of air, it can have detrimental effects on our health. This is not to say that we were not aware of living in or

breathing air before but the realisation of its effects on us lends a physicality to this awareness and is symbolic of a rude awakening of constantly being conscious of the air we live in.

Timothy Morton uses Sartre's notion of viscosity to explain this sort of a relationship by addressing our realization of the nearness to nuclear blast emissions and global warming. For Sartre, viscosity is how a hand feels when it plunges into a large jar of honey. The important point is that viscosity is not indicative of a leap that has been made into the honey, but consists of the realization that we are already inside the honey; it envelops and penetrates our very existence. Other scholars have interpreted what I understand as our *intimacy with air* through conceptual categories such as 'breathers' as offered by Timothy Choy to connote that while we all breathe air to live, there are unaccounted costs of breathing good or bad air. Similarly, Joseph Masco argues that the citizen is less a national subject and more of an earth dweller, by simply being a breather, such that we cannot escape air anywhere and that air envelopes the entire planet. In making these claims these scholars also seek to highlight an additional quality of living with air – attributing air an agentive quality. Humans have known that they need air to live, but the contemporary move has been to acknowledge a constant heightened perception of this erstwhile taken for granted fact. This is made more evocative in that the same air that allows us to live can have equally detrimental effects on our ability to live. The point is that in realizing this intimacy with air, we cannot escape it and therefore *must* be conscious of how it impregnates psychic as much as bodily cognition on a constant, everyday basis. At the psychic level, we are made to be conscious of and literally think about the quality of air we are breathing in. At the bodily level, through breath the air we live with creeps through our bodily interiors to settle in our lungs and even penetrates our blood stream. This recent awareness of our relationship with the air we breathe is a

result of a number of factors, significant among which are the culmination of science and the policy on air pollution globally.

Even though efforts to tackle air pollution in New Delhi can be traced to the change of a diesel based public transport system to CNG in the 1990s and as far back as the colonial period; it was in May 2014 for the first time that New Delhi became infamous for having turned into the most polluted city in the world. Though here I present the case of New Delhi, it is possible to trace air pollution related reforms in other Indian cities too starting from the colonial period. For New Delhi, becoming the most polluted city in the world was 'achieved' following the release of a WHO database detailing annual averages of pollution levels in cities across the globe. Since 2014, there has been increasing traction in science, policy and advocacy on air pollution in New Delhi, India, other parts of the world, and many Indian cities have consistently remained amongst the most polluted cities in the world. Historically, the quantification of air pollution was made possible through developments in science that converted air from matter to material, that is, there was a move from the individual sensorial perception of the quality of air in relation to place – through smell, temperature and movement – to scientifically accurate standards that qualified the quality of air. The scientific assessment makes the quality of air an index that is available for comparison and allows for material and symbolic means to facilitate communication and policy. Undoubtedly, more and more cities globally are being called 'polluted' on the basis of air quality and the heightened attention this has received in print and electronic media has been seminal in people becoming more acutely conscious of the air they live with and its effects on their quality of life and health. The proliferation of this kind of discourse in the recent past has been instrumental in pushing the student body of the university to make a claim for the suspension of classes on account of the bad air quality.

The second way in which I use 'with' to talk about our relationship to air is to point out the materiality of air. There is one singular layer of air that envelopes the Earth, but within this thin film in which all living and breathing species live, the constituents of air are in a constant process of movement. Multifarious gases and particulate matter – (particulates or particulate matter is a term used to describe air pollution. They are a mixture of solid particles and liquid droplets found in the air that come in a variety of sizes and can be composed of many types of materials and chemicals) – are in a constant process of swirling, flowing, condensing and then lifting to drift again. Freely flowing air (imbued with all its constituents) encodes its own force that can be experienced in varying degrees of velocity and the expanses it can travel over – a city, across states, nations and even continents – carrying and mixing with all it encounters along the way. In other words, saying that *we live with air* is a means to afford and acknowledge this agentive quality of air and all it includes. Encoded in living 'with' air, is the acceptance of the fact that the air exists independent of us, it has its own identity which deeply impacts but, in most cases, escapes any form of human control in varying scales – from the air in a room to the layer of air enveloping the planet that allows for the possibility of life.

It was this aspect of the materiality of air that occupied the better part of the classroom discussion in response to the request to suspend classes on account of bad air quality being denied. I asked students if they thought they could escape the air quality in the second half of October if they had remained in their hostel rooms? Many of them acknowledged that they had not considered this notion. This was not surprising at all, as the realization of living with air or becoming conscious of the effects that air can have on our ability to live, is often not thought of along with questions about the kind of a material medium the air is. Most homes or indoor spaces in India are not airtight. This is not only the result of the country being

predominantly hot and tropical, but is also rooted in the importance placed on ideas of ventilation and the possibility of free movement of air within the living space – as a means to ensure that 'closed' spaces particularly always get access to 'fresh' air from the outside. This has meant that the need to make a space air tight was not taken seriously until very recently, when discourse on air pollution picked up. There are now a range of private companies that convert living spaces into air tight spaces lined with air purifiers and filters to constantly clean indoor air. Undoubtedly these services are costly and can only be afforded by a select few, but it must also be acknowledged that even this is not a complete solution. The human body is a *breathing* body that must move from indoor spaces (that could be controlled for air quality) to the outdoors and then into other indoor spaces where the air is not or cannot be managed. The implication here is not only that we must live *with* air as realized in the notion of 'the breathing body', but that the flow, distribution, and filtering of air is not at all easy to control.

For example, an effective way to filter clean air into the body is by wearing well sealed N95 masks, but even these cannot be worn throughout the day. Further, these masks are costly and cannot be afforded by everyone. The classroom discussion in question was in pre-COVID times, so masks were not prevalent in the way they are now. Besides, a double layered cotton or surgical mask is not enough to prevent the breathing in of particulate matter, even though it may be an efficient defence against the transmission of the COVID-19 virus. In other words, due to the nature of particulates and gases that make up the air, the science and transmission of the virus is quite different from the way that bad air enters human lungs and then the cardiovascular system through breath. Of course, today we have companies which are marketing and selling masks that aid in preventing both the virus and air pollution from being breathed in, but the mere fact that there are specific (often costly and not

easily available) masks being marketed in such a way, emphasises the point that the transmission of the virus and air pollution have different trajectories. So, to come back to my original premise, unless students chose to stay indoors wearing N 95 masks on that day in October 2019, even if they had stayed in their hostel rooms, they would not have been able to escape the dangerous air looming in the university campus that enveloped us as we talked, carried out our daily activities and breathed.

II

Carson has shown how historians and social anthropologists have responded to 21st century environmental anxieties by forging a new consensus that, the 'atmosphere' is not just the English word that could designate the 'mood of a place' or the 'prevailing sentiment', but the physical gaseous, layer enveloping the Earth, – an object of human knowledge and a historical force in its own right. As such, there is compelling scholarly work (such as Edwards) that qualifies how the idea of the atmosphere was made possible, and how it culminated in the notion of a planetary climate as a single system enveloping the Earth. We may have learnt in our science or environmental studies textbook in school that the Earth's atmosphere is made of layers of gases that envelope the planet and are held in place by gravity, but this understanding was established through a long and laborious process amongst scientists globally that began in the 19th century and went through many phases of reassessment, friction and collaboration to result in the possibility of envisaging a singular planetary climate. Today, climate models or general circulation models are the best tools scientists have, to understand, represent and study climate. Climate models utilize quantitative methods to simulate the interactions of the important drivers of climate change. They are used for a variety of purposes from the study of the dynamics of the climate system to projections of future climate. This notion of

climate has developed over time as it was only in the 19th and 20th centuries that climate came to be envisioned as a fluid and dynamic system that, though planetary in scale, interacts and effects local weather patterns as well. Scientists continue to try and understand the complexity of the planetary climate to better comprehend what future scenarios await us.

It is this possibility of understanding the planetary climate as a singular, dynamic and complicated system that has placed us in the Anthropocene. The Anthropocene is the geological epoch that is characterized by human actions as a collective being capable, of shaping Earth systems, at par with non-human forces. Scholars from the social sciences and humanities have called into question the category of a uniform human or the Anthropos in the coinage of the current geological epoch as the Anthropocene. While these critiques are relevant, the more interesting effect the category of the Anthropocene has had is the emphasis it has placed on human-atmospheric relations. Climate scientists have argued that the anthropogenic moment is "nowhere more evident than in the atmosphere". This means that any social science and humanities engagement that seeks to understand what is happening in our contemporary worlds through everything that is emblematic of the Anthropocene, must take human-atmospheric relations seriously. It is this emphasis that is reconceptualising the questions social science and humanities scholarship consider worthy of investigation and driving home the realisation that in order to understand the planetary climate and its implication on how we live, we must take the atmosphere as a worthy and significant category for analysis. In this sense, the atmosphere as an object of study is exerting a historical force in the disciplines of social science and humanities.

I do not, however, claim that understandings of the atmosphere did not exist prior to the construction of the planetary climate by climate science. In fact, scholars agree

that the climate is as much a conceptual construction as a tangible entity. This means that over time climate science had led to the construction of the idea of the planetary climate, but simultaneously climate is also a material, tangible entity. The warmth on the back of my neck on a sunny day is as much a manifestation of climate as the melting glaciers in Greenland. Both of these are tangible and material – the back of my neck feels warm, which I can touch with my hands and feel the warmth. Similarly, it is possible to see how sea levels are rising on account of glaciers melting and this too, can be materially documented. On the other hand, the simulations that climate scientists are able to generate in a climate model are attempts to construct the planetary climate conceptually. And so it is, that the planetary climate as we understand it, becomes both materially tangible as well as a conceptual construction. Further, social science and humanities scholars have shown that ideas of weather and climate and their importance existed before the understanding of a singular planetary climate emerged. For instance, weather as studied through wind patterns has been seminal in the understanding of sea routes for trade, in colonial administrations for governing colonies with varied weather conditions, and in traditional medicine knowledge systems in different parts of the world that put forth varied understandings of the importance and effects of the five natural elements, one of which was air.

From this historical perspective, it can be claimed that the climate crisis is, in fact a relatively recent phenomenon that has propelled scholarly interest towards the extremes of scales in terms of expanse and time. In terms of expanse, I mean the evolution of the idea of a climate that is dynamic, fluid and all-encompassing with respect to the Earth. In terms of the scale of time, the implication is two-fold – that of human time and planetary time. By human time, I mean the time period during which the human species has existed on Earth, so that it is important to acknowledge

(as I have shown in this section) that historically, ideas of the weather have been intrinsic and specific to all forms of social institutions even before the phenomenon of climate change became a part of our social discourse. The second implication is that of planetary time which transcends the life span of the human species on Earth. Planetary time encompasses all the climatic changes the Earth has gone through over millennia that has ultimately culminated to us being placed in the Anthropocene. The Earth was formed 4.6 billion years ago, which represents the scale of planetary time. Human time is much shorter – while our ancestors have been around for about six million years, the modern form of humans only evolved about 200,000 years ago. Civilization as we know it is only about 6,000 years old. The air, in that sense, is not only part of the planetary climate but has been present in changing concentrations of the gases that form the atmosphere for millennia before the human race even appeared on Earth. What is of significance is to recognize, without ignoring the extreme scales of air's presence, the implications that living with the air is having on our everyday lives today and how our social worlds are being constituted by these processes. It is precisely this dynamic that has been recognized as an important analytical category for social science and humanities investigations in contemporary times. In other words, as I have argued the idea of the atmosphere has been around for centuries, but that in many functional ways it culminated as a planetary system with the scientific assertion of climate change. This propelled social science and humanities scholarship to engage with the atmosphere while being cognizant of its spatial and temporal scales. This means that any investigation of the human-atmospheric relationship as it affects us today must be alert to the way in which the atmosphere emerged as an important conceptual category and has led to the way in which we recognize our intimacy with air today.

III

I moved to the university campus located in western Uttar Pradesh in December 2018 from Delhi. My acquaintances and well-wishers not only from Delhi but also from other parts of the country, consistently asked me – the air must be better there? The question was not surprising given that narratives of the detrimental air quality had been spiraling in electronic and print media over the last few years. Since the university campus is located beyond Greater Noida, it was assumed that the campus was safely away from any urban conglomerate and would hence have better air quality (especially as compared to Delhi). The question about air quality has stayed with me for a number of reason, which I detail here. Firstly, just like the request for suspension of classes due to the detrimental air quality, the question of better air quality in the university campus is something that I could not have imagined being asked 15 years ago. What was also starkly noticeable to me was the marked consistency of the question – everyone who enquired about my move brought it up.

Second, this question was put forth by some along with questions of air quality data and the air quality index (AQI). The AQI is a weighted average that relates levels of pollutants in the air to human health. The range of what 'healthy' to 'severe' levels are for the AQI is fixed by the national government and varies globally. This is done keeping in mind the state of air in a country, trends of air pollution and designing realistic policy goals for improving air quality. While the numerous digital boards showing AQI across a few metropolitan cities in the country have had little effect on residents in determining their daily activities according to air quality, it would not be unreasonable to say that air pollution has become a much more discussed topic on the news and in everyday conversations in the recent past. This is reflected in mainstream news outlets not only carrying stories about the air quality of cities in

the country, but also sharing the levels of pollution in cities, which is often the average AQI of cities over a day. The AQI data can, however, only be generated in cities that have air quality monitoring stations. Such stations are not present in the same numbers or uniformly in terms of technology across cities. Even so it should be acknowledged that today, this data can be accessed for major cities through public and private sources. Of course, there are debates about the reliability of such data, but it is undeniably true that more and more air quality data is being shared on media outlets and other platforms such as mobile applications. The number of healthy air days in a year is a common discussion point on mainstream news channels, while in living room discussions, bodily reactions are increasingly being attributed to the state of the air, and cities in India are being compared on account of which is a better place to live in terms of air quality.

While these narratives have emerged significantly in the recent past and point to a growing consciousness to air quality and its implications on human health, it has not yet matured to the level of taking human-atmospheric relations as seriously as they need to be. The discourse on air quality is caters to urban spaces – which *cities* are the most polluted. Even the yearly debates on how crop burning in Haryana and Punjab is leading to a deterioration of air quality in the Delhi NCR region, focuses on the air quality in urban conglomerates. The implication is that crop burning in rural parts of the country is a problem as the polluted air so emitted from crop burning makes the air of nearby urban cities foul. Though research has qualified that air pollution is indeed trans-boundary (in some cases travelling far beyond state boundaries to traverse national borders) the impetus remains on understanding how the air of a city is being polluted even if the sources are from other places. This is precisely the implication in the question asked of me when I moved to the university

– as the campus is located beyond any city, the air quality should automatically be better.

This leads to yet another way in which the creation of certain spaces by polluting air is imagined. I have tried to indicate how air pollution is predominantly understood as an urban phenomenon in mainstream media. One of the reasons for this is that there is more air quality data being generated in urban spaces. One of the main reasons for this is how air quality policy is enacted and seeks to implement measure to quantify air quality. For instance, in India the Central Pollution Control Board executes and manages a nation-wide programme of ambient air quality monitoring network of air quality monitoring stations known as National Air Quality Monitoring Programme (NAMP). The network consists of 793 operating stations covering 344 cities/towns in 29 states and 6 Union Territories of the country. The point to notice is that the network covers cities, towns and union territories. In other words, for India, there is ambient air quality data only for urban spaces. In order to make the network more representative of air quality across the country in the proposed National Clean Air Program (2019), the central government has indicated that monitoring stations will be expanded to regions beyond cities.

In the WHO database, air pollution is mapped in two sections – ambient air pollution and household air pollution. The logic of the division is that household air pollution refers to air pollution generated by households due to activities such as inefficient bio-fuel burning from cooking in traditional cook stoves. Ambient Air Quality on the other hand refers to air pollution generated by all other outdoor sources of emissions such as vehicles and industrial units. In this understanding 'outdoor' is understood as sources outside the 'household'. The list of most polluted cities in the world is put out by data accumulated from ambient air quality. In other words, air pollution in cities is defined as the pollution caused by sources outside the

household. This inherently implies that modern cities such as Delhi have cleaner cooking sources in households such as LPG and electric stoves. Further, air quality monitoring stations that are the source for global data for the WHO are only present in cities in India and this data is taken under 'ambient air pollution'. Air Quality data in the WHO database deems the 'urban' (city) and the 'rural' as two separate spaces in codifying ambient and household air pollution separately. The data that is available for household air pollution is a result of development research conducted in rural parts of the country and not a result of the Central Pollution Control Boards' network of monitoring stations. The discourse on household air pollution has a well-documented history in policy-development initiatives starting with cookstove programs in India in the 1930s, mainly as a response to tackle pressures on forest resources. The interesting point is that these initiatives were undertaken to displace polluted air from inefficient bio-fuel burning from inside the household to outside the household. The programs have largely been proven unsuccessful as they did not lead to adoption of the improved and more efficient fuel burning stoves by target households. Scientific and developmental research prompting the successful uptake of efficient cookstoves is still underway. The result of these initiatives is that there has been a bifurcation of air pollution into 'urban' and 'rural' with respect to policy and related popular discourse. It could be argued that the split is on the basis of likely sources of air pollution – inefficient bio-fuel burning for cooking and heating needs in the household (rural) and all other sources outside the household (urban) – but I would argue that this sort of reasoning ignores the agentive quality of air and what it means to live with air. Moving air with its varying constituents encodes its own forces and flows through and past cities, states, nations and continents effecting everything it encounters on its way. All air in that sense is ambient, freely floating and mixing around us and travelling beyond boundaries (state, national and bodily)

to mix in all that is the atmosphere, and the categories of ‘ambient’ and ‘household’ air pollution do not capture this.

In 2019, UNEP put forth that there is significant scientific proof to establish that air pollution and climate change are two sides of the same coin. Not surprisingly, the possibility of this claim is premised on understanding the planetary climate as a singular, dynamic and complex entity that envelopes our very existence. The air may be better on the outskirts of the Delhi NCR region but we must also be conscious of how we cannot escape the air and what it means to take human-atmospheric relations seriously in the way that we live and shape our future(s). The Anthropocene, in this sense, is most apparent in the atmosphere. Gases and particulate matter are emitted in, mix, travel and make the atmosphere. Being alert to human-atmospheric relations means taking into consideration the iterative processes that operate perpetually at multifarious scales, simultaneously and are encoded in every breath we take, how air penetrates all bodies and the swirling descent and ascent of airborne materials in our intimate immediacies to planetary scales and back.

*****

Cli-Fi : A Polemic

Ankit Prasad

A Wink of Ink And Plastic : Oddborg Reinton

Expanded as “climate fiction” or “climate change fiction”, cli-fi has been defined in multiple, often contradictory, ways. By all accounts, the term originated through journalist Dan Bloom sometime between 2008 and 2011. While there are some who include works of nature writing, such as Henry David Thoreau’s *Walden* (1854), as cli-fi, it is more meaningful to define it as fiction that engages with the concept of “climate” – a long-term pattern of weather conditions in an area – and anthropogenic climate change, the understanding that human activity contributes to changes in climate patterns. In any case, definitions can be a tricky, and often misleading path towards understanding a literary phenomenon. Definitional concerns would take us into very specific and pedantic issues, so in this essay I will focus on situating cli-fi within a larger milieu.

Too often we are obsessed with the new and shiny, in literature as in life, and going by most discussions on cli-fi on the internet, it would seem that it is an unprecedented, world-shattering new genre. One of the features of ecological thinking is to recognize that no phenomenon exists in a vacuum, and the same is true of genres in literature. As far as the market is concerned, genres are designed and manipulated to act as a brand. Marketing cli-fi as a shiny new article of consumption masks the fact that it exists within and is a contemporary manifestation of a long tradition of human reflection on the environment. But the market is designed to do precisely this, so we should not be surprised. What is more, we should not take what is presented and (thanks to the internet) multiplied thousandfold as an accurate portrayal of cli-fi. Genres are not an *a priori* but conjured-up entities; the only proper way to think about genres is to question them and hope to coax and tease out what is not immediately apparent about them.

When the editors approached me to write about cli-fi, the term immediately conjured up other words and concepts: “ecocriticism”, “climate”, “climate change”, “sci-fi”, “Anthropocene”, “anthropocentricity”, “Solarpunk”, “Prakṛti”, “Gaia”. In its specific association with each of these, cli-fi can be introduced from very different perspectives, each ultimately connecting with the others in what is a complex, multifaceted area of thought. In fact, I believe cli-fi can act as a multi-directional bridge connecting these areas and providing space to reflect on them and their relationalities within the same text. It is not possible to do justice to this endeavour in a single essay. What I have chosen instead is to present cli-fi as being in dialogue with two related and older phenomena: ecocriticism and science fiction. Running through and connecting the discussion will be an engagement with a text that is quickly becoming canonical: Amitav Ghosh’s *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable* (2016). In doing this, I hope to spark new ways of thinking about cli-fi that don’t necessarily take their cue from the marketplace, the same market that is complicit in the ecological crisis facing us today and is now attempting (rather successfully) to turn our focus to newer and shinier products in the hope of deflecting attention away from itself. The challenge is to think of cli-fi not as another consumable product but a site that allows reflection on many interrelated aspects of living on this planet.

Ecocriticism And Cli-Fi

In its earliest forms, Scott Slovic writes, ecocriticism was “the study of explicitly environmental texts from any scholarly approach.” From our vantage point, it is best understood as a way of reading culture (including literary texts) through an attitude that assumes that “the Earth matters.” Though often seen as a specifically scholarly and/or literary pursuit, the insights coming out of ecocriticism have been broadly influential to how we think and understand questions relating to the environment and

ecology. From its advent in 1960s USA, it is now available to us through at least three, and arguably four, waves.

The first wave studied examples of nature writing to conceptualize "nature" as an entity separate from the human and worthy of being studied on its own. Typically, "nature" is here contrasted against both the "human" and "technology". The second wave questioned these boundaries, shifting focus from "nature" to the broader category of "environment", which additionally encompasses the domain of the "human" – urbanization and technological development. As a result, during this phase, there was increasingly a focus on ecological disasters, especially due to human-induced factors. In the third wave, reflections on these questions started moving beyond the predominantly white-American/British context, paying attention to insights emerging from different nationalities and ethnicities. These additions signal towards a more planetary understanding of ecological issues. Rob Nixon's concept of 'slow violence' is one example of the kind of scholarship that emerged from within this wave. In terms of the genres typically considered for study, the third wave represents a change in focus. While the first and second waves drew primarily on "nonfiction prose and the fiction of nonfictionality," the third wave invites reflections on fictional representations of ecological issues.

The fourth wave, continuing very strongly in our contemporary moment, represents a focus on materiality. Drawing insights from object-oriented ontology and new materialism, it draws attention to the way "the human is always intermeshed with the more-than-human world" and how the corporeal, physical, material existence of humans is inseparable from "the environment." It questions the easy distinction between "humans", "technology", and "nature". As may be apparent, this way of understanding ecology is in direct contrast to the first wave. Significantly, and probably as a result of the insights emerging from diverse contexts, it redefines "the

environment" from being an inert space that has been merely (ab)used for its resourcefulness to an active, agentive entity that acts as much as it is acted upon.

This reflection on the nonhuman, which continues strongly in contemporary thought, has been engaged with at some length in Ghosh's *The Great Derangement*. Ghosh begins by talking about the palpable presence of the nonhuman in one's everyday experience:

"Who can forget those moments when something that seems inanimate turns out to be vitally, even dangerously alive? As, for example, when an arabesque in the pattern of a carpet is revealed to be a dog's tail, which, if stepped upon, could lead to a nipped ankle? Or when we reach for an innocent-looking vine and find it to be a worm or a snake? When a harmlessly drifting log turns out to be a crocodile?"

The first section of the book is entitled "Stories", and it deals with the specific deficiencies of the novel as a literary form. In it, Ghosh is at pains to stress that the literary imagination has not been able to represent the nonhuman. This inability, for Ghosh, explains why writers struggle to represent the images and events associated with the ongoing climate crisis. For such representations of the nonhuman to become possible, writers would have to engage imaginatively with the nonhuman, in particular "the environmental uncanny," such as "freakish weather events". This insistence on representing the nonhuman dovetails with material ecocriticism, one of the major components of the fourth wave of ecocriticism.

Though Ghosh only mentions cli-fi once in passing – and not at all in this context – it is evident that the kind of fiction he advocates (and subsequently writes in *Gun Island* (2019)) can easily be classified as cli-fi, inasmuch as it pays attention to climate change. So, one way of understanding cli-fi can be to situate it within the

milieu of thought (across disciplines and practices) that has turned its attention to the nonhuman. This would explain why cli-fi is quickly gaining traction with scholars and readers alike. It is one of the ways – though perhaps the most popular – to think about and come to terms with the nonhuman.

The turn to materiality and the nonhuman represents a change in focus in Western philosophical thinking, even though the kernel of this thought has been present in the tradition for quite some time. Since the patterns and habits of centuries of thought weigh heavily on the present moment, it is in the realm of fiction writing that these issues can be freely explored. It is here that cli-fi plays an important role. As one instance, the nonhuman can often become a character in cli-fi, affecting other (human) characters and directing the narrative the same way that a human character would do in the traditional realist novel. For instance, Dale Pendell's *The Great Bay* (2010) is narrated by Nature/Gaia. The tenet of material ecocriticism – that humans are always intermeshed with the nonhuman – is often made apparent in cli-fi narratives, where human characters have to confront and (if they can) navigate through nonhuman occurrences. The fact that some of these occurrences may have been set in motion through human activity only accentuates the point about intermeshing.

Sci-Fi And Cli-Fi

However, there is a peculiar assumption running through the book, and this pertains to the place of science fiction and other speculative genres in the larger discussion on literature and representation. Throughout the section on fiction writing, Ghosh tries to think through what it would mean to represent the "unthinkable" in the contemporary novel, and what challenges the form of the novel poses to writers. In

smaller doses, the topic of science fiction comes up, and it is defined in contrast to "serious" fiction:

When the subject of climate change occurs in these publications [*London Review of Books*, *New York Review of Books* and others], it is almost always in relation to nonfiction; novels and short stories are very rarely to be glimpsed within this horizon. Indeed, it could even be said that fiction that deals with climate change is almost by definition *not of the kind that is taken seriously by serious literary journals*: the mere mention of the subject is often enough to *relegate a novel or a short story to the genre of science fiction*. It is as though in the literary imagination climate change were somehow akin to extraterrestrials or interplanetary travel.

Let us first note and then elide the point I have tried to indicate through italicization: instead of interrogating the category of "serious" fiction (questioning, for instance, what constitutes the seriousness of literature or which genres qualify), Ghosh seems comfortable accepting a hierarchical category such as "serious" fiction on the basis of the practices of certain (influential) literary magazines. But let us elide this point, for it is only tangentially related to our central concern. What then? Yes, it is true, of course, that science fiction has not traditionally been seen as "serious" literature by the literary establishment, imagined by Ghosh as a "mansion". In fact, the stability of this establishment is built on the relegation of non-realist/genre fiction to the "outhouses". However, the "seriousness" of science fiction has ceased to be a debatable question for quite some time. The relevance of science fiction to address fundamental questions that face us today – involving, among other things, the ethical questions related to artificial intelligence and biotechnological experiments, the future of work, and the relationship between the human and the nonhuman – has been recognized for quite long. The magazines indicated by Ghosh are invested in

the maintenance of stable genre categories, not least because this hierarchical relationship was crucial to their own coming-into-being.

For those not taking note, it would come as a surprise that in recent years, the mansion has been crumbling. And genre categories are crumbling too. The outhouses have been slowly melting into each other and creeping upon the mansion. The walls of the mansion are melting. Some inhabitants of the erstwhile "serious" mansion – among them, notably for us, Nayantara Sahgal (*When the Moon Shines By Day*) and M.G. Vassanji (*Nostalgia*) – are familiarizing themselves with these new entrants. Under such circumstances, this new literary phenomenon that we call "cli-fi" will need to find a place within this beautifully grotesque structure, a structure that is no longer a sign of classic bourgeois identity but a shapeshifting monstrosity. This beautiful, shapeshifting monstrosity – equipped with widespread readership and free from the drawbacks of bourgeois nostalgia – is what we need to pay attention to.

Let us see what more Ghosh has to say about science fiction and, specifically, about cli-fi:

"Is it the case that science fiction is better equipped to address the Anthropocene than mainstream literary fiction? This might appear obvious to many. After all, there is now a new genre of science fiction called "climate fiction" or cli-fi. But cli-fi is made up mostly of disaster stories set in the future, and that, to me, is exactly the rub. The future is but one aspect of the Anthropocene: this era also includes the recent past, and, most significantly, the present."

There are two takeaways from this: first, that cli-fi is a subgenre of science fiction; second, that cli-fi is constituted primarily of "disaster stories". The view that cli-fi is

a subset of science fiction is no longer tenable. Why? Because cli-fi is not *necessarily* speculative in nature, though often it is. The only element required in a cli-fi narrative is engagement with the issue of climate/climate change, whether in a speculative or a realist mode. But one can see why cli-fi could be considered a subset of science fiction. First, the term "cli-fi" derives from "sci-fi," a derogatory contraction of science fiction that has been used to relegate science fiction as a genre that deals only with themes like "talking squids in outer space" (according to Margaret Atwood) or "extraterrestrials or interplanetary travel" (according to Ghosh). Ghosh extends this attitude towards cli-fi by dismissing it as "disaster stories."

Second, cli-fi is often seen to be a movement within science fiction that deals more explicitly with ecological themes. This view is historically more accurate inasmuch as science fiction has a long history of representing such themes. In fact, some of the few critical works that exist now on cli-fi draw its history back to texts like J.G. Ballard's *The Drowned World* (1962), a consciously science fictional text. Before it became mainstream to talk about climate change, science fiction (and other speculative genres) were taking up these themes and constructing narratives around it. Oeuvres of celebrated science fiction writers like the late Ursula K. Le Guin and Kim Stanley Robinson (to name only the most recognized) show a sustained and developing engagement with the issue of living with a changing/changed ecology. Closer home, Jayant Narlikar's "The Ice Age Cometh" (1992, but published earlier in Marathi) also tackles the problem of climate change through a science fictional narrative. There is something in the very nature of speculative genres that would allow such issues to find *imaginative space*, something that Ghosh is needlessly trying to carve out a space for in "serious fiction" in 2016.

Even though cli-fi is inextricably linked to science fiction and would be fruitfully studied in terms of that relation, it is also a literary phenomenon that has a claim to be understood on its own terms, especially in the way it has developed in this century. From this perspective, a too-strong focus on its relationship with science fiction – particularly when coming from an attitude that sees science fiction as a deficient/"unserious" genre – can ghettoise it. That would hardly be a useful way to study cli-fi. I believe the strongest claim for studying cli-fi apart from science fiction is its assumption and engagement with "climate" and "climate change". The earlier speculative texts that have treated of climate-induced crises did not operate within an atmosphere that called for urgent redressal (or the vociferous denial) of climate change. These two terms are the very lifeblood of cli-fi, and cli-fi would make little sense without the larger cultural discourse that has built around these terms in this century. Here, again we can see a similarity – similarity, not equivalence – between cli-fi and science fiction, the latter having developed out of a cultural atmosphere that was starting to engage with the term "science."

The view that cli-fi is made up of "disaster stories" – a manifestation of dystopic narratives – is a case of confirmation bias. It is true that such narratives inundate the field, but that is not exclusively a cli-fi phenomenon. Even if we leave aside the fact that dystopia is a useful narrative form for thinking through certain themes (and that the classic dystopia à la *1984* has been supplanted by the "critical dystopia"), the prevalence of such themes in cli-fi is but another manifestation of the broad narrative fascination with and marketability of dystopian tales, which visual media has only accentuated further. Dismissing cli-fi on this count is like dismissing realist narratives as a mode of storytelling because most of them are formulaic, uninteresting character-driven explorations of individual subjectivity that sustain themselves – in a Coetzeean fashion, but with less craft – on a calm pessimism and

offer no resolution. The more we say that cli-fi is a quintessentially dystopic genre, the more we will see it as such. For me, this is not so much an argument against cli-fi (though for Ghosh it is) as an inaccurate portrayal of it. Instead of parroting the same opinions, we need to know where to look for alternatives.

If we look at the stories of Vandana Singh, for instance, we will find narratives that accept the approaching reality of climate change without necessarily painting a dystopic picture. Take the example of "Indra's Web" or "Requiem" in her 2018 anthology, *Ambiguity Machines and Other Stories*. The stories mix scientific insights with indigenous knowledge to present a bottom-up approach to the climate crisis. While resolving some issues and not being able to resolve others, the stories present a realistic and quite "serious" picture of how bad things are. But this does not lead necessarily to a pessimistic or disastrous ending. "Indra's Web" ends with the death of the protagonist's grandmother but the success of the Suryanet experiment. "Requiem" ends by bringing a resolution to the protagonist's feelings but shows how corporate greed is likely to spell doom to any attempts at resolving the crisis. "Reunion" (2019), a sequel to these two stories set in the same narrative universe, broadens the focus of these forays by representing the ecological changes happening at a planetary level. Here, more fervently than the previous stories, the climate crisis is presented as an animated nonhuman entity – Gaia – resettling itself into a new form, with all the attendant destruction that would naturally come along with it. This perspective is held alongside the culpability of corporations and the small-scale efforts of individuals and indigenous communities, the ultimate effectiveness of which is left ambiguous.

Incidentally, Vandana Singh has responded to *The Great Derangement* in what is in my view the most subtle and effective rejoinder to the text. While allowing that there indeed exists "a problem of the imagination", Singh draws attention to how stories

in and of themselves will not be able to avert the crisis: "We must acknowledge that imaginative literature – no literature – can ever be enough. We are called to do much more than write or run workshops – to face the possibility of hell itself, and then get to work." Related to this is her critique of how *The Great Derangement* lacks proper engagement with environmental movements. The distinction between environmental movements and the climate crisis, implicit in *The Great Derangement* as in the popular imagination fed by advertisements, is unnecessary and even dangerously playing into the hands of a corporate takeover of the crisis. During the Chipko Movement, for instance, poets like Ghanshyam Raturi played a key role, creating literature that should arguably inform how we in India conceptualize cli-fi. Similarly, Solarpunk as a literary and more broadly an artistic phenomenon has always been as equally invested in political changes as in imagining aesthetic possibilities for a sustainable future. If by "addressing" climate change in literature we also mean tackling its world-shaping implications, then there is a need to conceptualize cli-fi by aligning it alongside these radical movements and the literature they have engendered.

These are some examples that I am familiar with; any individual aiming to engage with cli-fi beyond definitional and categorical concerns will certainly find more instances of what I am suggesting here. Far from thinking of Ghosh's assertion about this generation's imaginative failure vis-a-vis climate change – so that when "future generations look back upon the Great Derangement […] they may well hold artists and writers to be equally culpable" – holding true, I believe that future generations will know (better than us) where to look for this imaginative engagement with the crisis at hand. And cli-fi, even if it is called by another name then, would have played a key role.

Where To From Here? Possibilities And Dangers

While suggesting cli-fi's necessary relationship with climate change, I have used the word "engagement" and not "representation". This is because as it develops further cli-fi will start complicating the normative understanding of its operating terms – "climate" or "climate change" – just as science fiction has been doing for decades with "science". Though most cli-fi narratives will engage straightforwardly with the discourse on climate change, some narratives will question the working assumptions. Ian McEwan's *Solar* (2010) – a satirical take on the moral force behind climate consciousness – represents one such attempt.

A more recent example is Varun Thomas Mathew's *The Black Dwarves of the Good Little Bay* (2019). Set in the aftermath of an ecologically devastated Mumbai, the novel throws an imaginative challenge to the very conception of climate change. At its heart is a speculative question not very different from Ghosh's "What might happen if a Category 4 or 5 storm, with 150 mph or higher wind speeds, were to run directly into Mumbai?" It asks: What might happen if it suddenly, inexplicably stopped raining in Mumbai? And this is part of its speculative answer:

Everyone was shocked by the peculiar behaviour of the clouds, and no one could explain what was going on […] The despairing state government called upon hordes of priests and other species of holy men to perform rituals, make sacrifices and entreat the clouds to open up, but their efforts went in vain. By the third straight rainless year, our city's groundwater reserves had been depleted, and since water is essential to the sanity of man, people were brought to the verge of madness. I remember those days…riots broke out, fires were started, property was destroyed and almost every window in every government office was shattered. Eventually the

army was called in to maintain order, though this rather compounded the matter, for soldiers, as you must know, are far thirstier than ordinary men.

The issue of sudden change in climate conditions is a direct reminder of climate change. I write this sitting in Hyderabad as it pours outside. This is my third monsoon in the city. In the last two years, Hyderabad got some showers during August and September, which has to my knowledge been the norm. This year, however, it has been raining almost regularly since May, with even April having seen some showers. Some reports suggest that this is part of a larger shift in rainfall patterns across India, where north India is going to see less rainfall while the south experiences more and more. So the situation described in *Black Dwarves* rings true. The novel builds on this apocalyptic imagery quoted above to portray a confusion within Mumbai, borne naturally out of the non-uniform, diverse reality of life in that city. Though portraying a "disaster", the novel turns the discourse of climate change on its head. As the crisis deepens, a political opportunity arises for the Chief Minister to herd the entire population into a climate-controlled structure, the Bombadrome, which later becomes a means to enforce uniformity in the citizens and rewrite history. Interestingly, the CM wins the trust and support of the frightened population by explaining the devastation in the normative language of the climate crisis:

He was not superstitious, and since people crave rational explanations for everything that befalls them he gave them several. He explained away the invasion of the sea, blaming it on the melting of the polar ice caps and the rise of ocean levels across the globe. He attributed the city's atmospheric changes to decades of environmental degradation and the chemical reconfiguration of our surroundings. […] To explain away the ruin of our city, he popularized wild theories about the environmental havoc caused by global warming, solar winds and even the gravitational influence of a white dwarf star in the vicinity of our solar system. […] Newspapers and social

media broadcast his assertions far and wide, and even the textbooks in our children's backpacks were altered to teach them that the only sins of their fathers were unchecked pollution and environmental abuse. And once you people were convinced, he set about rebuilding the city.

The counterargument to this narrative is provided by the narrator, who believes that "the earth beneath our feet," an animate, vengeful entity, "has rebelled against us." For him, the devastation is the nonhuman's accounting for the cruelty of anthropogenic actions – not necessarily or simply against the environment. He then provides an account of the history of post-independent India, detailing the many wrongs inflicted on the citizenry. It is, he argues, these wrongs, and particularly the one orchestrated by the CM in his quest for power, that becomes the last straw. The unforgivable nature of the CM's actions lead to the first calamity, the clouds refusing to rain over the city, rains being a symbol of forgiveness. As the narrative progresses, we see how all characters except the narrator ultimately gives in to the CM's narrative, preferring a rational argument even if it has gaps because it masks their complicity and provides an impersonal rationalization. It is only in the narrator's counter-account that the history of the nation and the revenge of the nonhuman is given any space.

One's reaction to *Black Dwarves* may be discomfort. Turning the scientific truth of climate change into a contested political agenda may unsettle one's nerves. But the novel foregrounds one of the dangers facing us as we struggle with the ecological crisis – the co-optation of the climate crisis for an extension of the political (which is also the economic) status quo. The question raised by the novel is about the interconnectedness of human actions, a historical awareness that the climate crisis is one (though the most staggering) manifestation of the dominant economic/political direction of the world. The focus in the novel is not on the notion of climate

irresponsibility but on the way anthropogenic climate catastrophes signal the broader ideologies that inform how we behave with each other too. In this respect, the anthropogenicity of the climate catastrophe in *Black Dwarves* comes from the human mistreatment of an "environment" that consists of other humans and nonhuman entities.

In Lieu Of A Conclusion

This rather long analysis of one novel provides a segue into my biggest concern for cli-fi in the future. Going forward, one of the questions that cli-fi will have to combat will be its "relevance" in the face of the climate crisis. Even now, one sees discussions on cli-fi that justify it on the basis of its ability to inform people about climate change. The usual argument is that cli-fi is "useful" to us because it can communicate large sets of "uninteresting", "boring" data on the ongoing crisis in an interesting form. The hope is that fiction, because it is engaging and entertaining, will make more people aware about climate change. Perhaps an implicit hope, particularly in the American imaginary, is that climate change denialism can be challenged in this manner.

The larger question here is of course about what fiction can *do*. Fiction is of course able to do all of these things to some extent – it can disseminate ideas and act as a channel of communication; it can break down complex datasets into narrative form; it can raise awareness. Yes, it *can* do all this. But it is ill-equipped to handle the climate crisis or any other crisis by itself. It may ride on a wave of cultural energy – it happened with science fiction in the twentieth century, it is happening with cli-fi in our times – but as a whole it always exceeds the dominant arguments of the cultural milieu. As a genre develops, it always opens itself up, imagines new ways of expression, explores new ways of framing a phenomenon. It *imagines*, creates. It

is not as great at convincing readers as it is made out to be. It cannot bring about large-scale change in opinions – it absolutely cannot transform whole populations of climate change deniers. To achieve these things requires political movements, changes of governments, and lots of work on the ground.

If cli-fi is conceptualized primarily as a way to spread awareness about climate change, it will run against a couple of barriers. The first, and this might seem particularly relevant to *Black Dwarves*, is that it will be required to present only that which is scientifically accurate. Questions about how to frame the issue of climate change – and there are many frames that exist in various cultures – may lead to charges of climate change denialism. In short, cli-fi runs the danger of becoming merely a vehicle for scientific communication. This would restrict its speculative ability – and speculation here does not mean prediction/probability but a broad-based imaginative engagement.

Second, and following on from the former, cli-fi may face the same problem that science fiction has been facing – the framing of "literary"/"serious" versus "outhouse". The history of science fiction gives us a clue here. When a Margaret Atwood or Kurt Vonnegut distances themselves from science fiction, preferring to be seen as "literary" writers, it sets a precedent for scholars to read thought-provoking, radical works of science fiction as "serious" fiction; it is as if the mansion has allowed a couple of "good" outcastes into the mainstream, provided they give up all association with the outhouses and add to the mansion's prestige. A similar fate may await cli-fi, where if it is not properly situated in the messy milieu that it emerges from, certain texts can be easily picked off as instances of "serious" fiction (these would typically be the ones that confirm or add to the existing consensus on both climate change and standards of literariness), while the others that don't serve the purposes of the mansion can be stocked off into the outhouses. As an instance,

look at what Ghosh does in *The Great Derangement*: the book is peppered with references to works of science fiction and ways of thinking that would properly be called speculative; yet, even as he draws upon these works and ways of thinking, Ghosh can – as if with a flick of the arm – dismiss science fiction as being about "extraterrestrials." This is the same strategy that "serious"/"literary" fiction has used to keep itself alive and relevant as the world has outgrown it: it uses its prestigious station and the desire of writers to be associated with it to appropriate works that properly belong to other genres. This will be attempted with cli-fi as well.

To some extent, these warnings will be in vain. These co-optations will happen. The force of the status quo is too strong to believe otherwise. What we can hope and strive for is to keep the broader potential of cli-fi alive. As readers and critics, we can be aware of these strategies and struggle to see these genres as multidimensional entities that encompass within them various modes of thinking about the world. This is what fiction has always done and is best suited to do. We need to resist overarching frameworks that examine works of fiction primarily through criteria that emerge from other spheres of enquiry. Cli-fi is growing; it will soon sprout wings. My hope is that we let cli-fi fly, not chain it down. Within the frames of thinking it encourages, we may find older, all-but-extinct ways of reflecting about ecology find a wider scope of expression; new ideas, subgenres, and people's movements may germinate from its flight. These and much more. Such is my hope for cli-fi.

References

Cover Art: A Wink of Ink and Plastic by Oddbjørg Reinton

*****

The Human and The Nonhuman: 'Socio-Environmental' Ecotones and Deep Contradictions in The Bengali Heartland

Annu Jalais

Fishermen of Sundarbans - Picture Courtesy: Wikimedia Commons

This essay was originally presented in the conference “Ecotones 4 – Partitions and Borders, Kolkata” presented at the CSSSC in December 2018. Her talk was published in 2020 under the title ‘The Human and the Nonhuman: Bengali “environmental” ecotones and their contradictions’, in the book “Borders and Ecotones in the Indian Ocean: Cultural and Literary Perspectives”, ed. by Markus Arnold, Corinne Duboin and Judith Misrahi-Barak, pages: 127–150. Collection ‘Horizons anglophones: PoCoPages’; Presses Universitaires de la Méditerranée (PULM). Professor Jalais graciously gave us permission to reprint this lecture as part of our special series on Climate Change and Ecology.

An Ecotone describes an area that acts as a transition or boundary between two ecosystems. This could be, for example, an area of marshland between a river and the riverbank, a clearing within a forest or a much larger area’ (Thorpe 2014). Ecotones are both of great environmental importance as well as being very fragile ecospheres. For the convenors of this conference, and I cite, ‘an “ecotone” may also indicate a place where two communities meet, at times creolizing or germinating into a new community.’ As they explain, this term, traditionally used in environmental studies and geography, has here been applied to postcolonial studies in disciplines such as literature, history, the arts, social and political sciences, ethnic studies, ecocriticism, etc. in an urge to explore the ‘complex chemistry’ of creolizing worlds (Cohen 1997). As ecotones are the ‘contact zones’ between cultures (Pratt 1991) in contexts such as migration, diaspora, refugee movements and other postcolonial displacements and environmental evacuations, ‘how do the languages, the cultural practices, the scientific knowledge, and environmental concerns meet and transform in these newly constructed ecotones?’—they ask. Literary and political movements necessarily cross paths and pollinate, following different routes and creating a diverse universe, in which a single and fixed origin can only be

questioned. So certain communities, usually lesser known as on the margins, as well as subaltern, help us understand new forms of belonging, bonding, and citizenship to specific places. In the context of Bengal, for example, how do different communities negotiate shared space when notions of about nonhuman animals and human bodies differ?

Specific but little known 'points of contact' are fascinating as they have necessarily germinated novel cultural practices. Social anthropology as a discipline has, more recently, helped us understand these 'ecotones' of sorts. This chapter will discuss recent perceptions about nonhuman animals, meat and bodies between Indian middle-class higher-caste urbanites and subaltern Bengali communities (mainly of the Sundarbans) to critically compare their paradoxical differences. One can argue that Bengal itself is a kind of ecotone compared to the Hindi-speaking, Hindutva-loving, deeply patriarchal north Indian belt. The region of Bengal was partitioned twice in the 20th century and Bengalis have numerous representations of what the Bengali 'homeland' meant and means (Jones 2011: 373; Kabir 2013). In a way, both Kolkata, the capital of West Bengal and its urban centre, as well as the Sundarbans, the low-lying essentially rural and poor region that is made up of hundreds of islands, are socio-cultural 'ecotones'. But in different ways. Kolkata holds in its bosom both the Bengali heartland as well as the diverse religious and ethnic communities that came and settled because of its trading and political position during the British Raj. It has also been at the heart of a deep reflection of what it means to be 'Bengali', as opposed to 'Indian', by 19th century authors such as Tagore (in this connection read Supriya Chaudhuri's probing piece on Tagore's novel Gora 2012). The Sundarbans are a liminal space—an ecotone both geographically as it is between land and water as well as socio-culturally as it is a borderland between Bangladesh and West

Bengal, between Hindu and Muslim, between land-based and forest-based and river-based occupations.

As pointed out by Sonali Dutta Roy in her recent article on Bonbibi, Bengal is a particularly 'syncretic' place with 19th century scholar Akshoy Kumar Dutta listing how—out of some fifty syncretic sects found in India—forty of them were found in Bengal (66). She discusses how the spread of Chaitanya's Vaishnavaite movement and Bengali Sufism, both of which preached egalitarian values, gave birth to numerous 'syncretic sects such as Karta-Bhajas, Ram-Ballabhis, Lalanshahis, Darbeshis, Bauls, etc, some of which are popular till date in many parts of rural West Bengal' as well as in Bangladesh. Similarly, the mythic figure of Satya Pir (believed to be both an avatar of Krishna as well as a Sufi saint), has a wide following amongst Hindus and Muslims alike in Bangla-speaking regions of South Asia (Stewart 2004). Sumanta Banerjee rightly points out how this syncretic 'intermixing' is more obvious in the 'popular' lesser-known religious rituals and practices, than in the elite orthodox and mainstream versions of Bengali Hinduism or Islam, and says that this is because:

While the 'great' traditions of orthodox Hinduism, Islam or Christianity had become powerful mainly through sustenance by, and orientation towards, state power, the 'little' traditions of popular syncretic religions in India developed in nooks and corners of civil society primarily from the needs of the common people in their daily struggle for survival as well as salvation, rather than intervention in the polity.

I argue that these contradictions between contemporary urban Hindutva and more rural and subaltern Bengali Hindu and Muslim religious practices reveal not just deep-seated ideas about caste and community but also reveal a particularly distinct relation to the nonhuman.

The first proposal I wrote in relation to what I wanted to explore for my doctoral thesis concerned the ways in which Bengali literature had represented the Sundarbans. My supervisors weren't too keen on me working on that. So, I decided to focus on what the islanders thought of mainland Bengalis. This was brought forcefully into my consciousness the first week I was there when an islander, upon hearing that I would be writing about them, had quipped 'aren't we just tiger food for you lot?' This made me look at how the islanders saw the disjuncture between island and mainland, between 'down' and 'up', between them as fishers or peasants versus the upper caste, cultured, people of Kolkata and beyond, between tigers and humans, in a completely new light (Jalais 2005; 2007; 2008; 2010a and 2010b). I call the Sundarbans a 'socio-cultural ecotone' because it is a place where communities coming from many different places: mainland Bengal, Chotanagpur, more recently from East Bengal as refugees; observe, as I mentioned above, decidedly mixed forms of religious practices. The area is known for how Hindu and Muslim communities venerate a 'super-power' called Bonbibi. It is a region where the divisions of religious doctrine do not interfere, as much as in other parts of India, in the pragmatics of daily living. It is indeed a place where one's caste, one's religion or one's gender identity happens, often enough, to be less important than whether one works in the forest or on land (Jalais 2014; Alexander et al. 2016). What had also struck me, after that initial sarcastic remark, was how the islanders spoke about the forest and nonhumans. I was curious to know why, for example, the Sundarbans islanders kept insisting that I enter the forest to understand 'their' tigers. The forest was seen as some sort of 'pilgrimage' site even though it wasn't called as such. One of the forest deities' places of worship—the Gazi's—was called pithasthan. Going to the forest could be seen as a sort of 'liminal' experience that brought people who are in its realm to partake of a sense of community feeling (or 'communitas') with each other (Turner 1974: 166). As such, the forest served inherently to isolate one

from one's socio-cultural environment, bringing people into 'a form of institutionalised or symbolic anti-structure' (Turner 1974: 182) by becoming a sort of 'ecotone'—an ecotone that extended to the rest of the region. One of the important philosophical dilemmas of forest fishers, and especially of tiger-charmers, was trying to find a compromise between living a life ruled by the demands of the cosmology of the forest versus one ruled by those of rural Bengali sociality (Jalais 2010a: 86; 2010b). If those who worked in the forest as fishers believed that the forest had a common law for all humans and nonhumans who entered and lived in the Sundarbans Forest, they also believed that that 'forest law' was superior to the laws dictating the segregations of caste, class, religion, and gender between humans. This 'forest law' was believed to have been established by the forest 'super-power' Bonbibi sent by Allah to the forest to establish some sort of understanding between nonhumans and humans. An entity represented as a goddess by Hindus and as an earthen mound by Muslims, venerated with fruits and sweets and the reading of a booklet that exhorted humans and nonhumans to live together as 'brothers' as all were her children. And this was why, they explained, humans and nonhumans 'understood' each other. The cordial relations between humans and nonhumans, and by extension between humans themselves, were very different from the relations organised around the divisions of land and property where befriending the powerful and the well-connected i.e., having exclusive links to the mainland bigwigs as well as the heartland of Bengali culture, brought one success (Jalais 2010a).

I started to see Sundarbans islanders' 'interactions' with nonhuman wild animals as similar to what the Amazonians (as discussed by Descola 1996; 1992) practiced and felt for their own wild nonhumans. For the Sundarbans islanders, tigers could be humans and vice versa just as for the Jivaro (in the Amazon), humans could be Jaguars and vice versa. Similarly, even though the majority were Hindus, cows were

not really seen as nonhumans that were due any more respect than say goats or buffaloes. The nonhumans that were owed respect were the wild ones that resided in the forest because they lived lives dictated by the precepts of equality and compassion of which the 'laws of the forest' were made up (Jalais 2010a: 85). This different set of meaning-giving to two symbolically charged nonhumans i.e., the tiger and the cow, was very different from the ways in which I had been sensitized to seeing these animals while growing up in Kolkata. I had been brought up to see animals as either 'sacred' i.e., the cow, the monkey, or the crow, or, auspicious and special like the hilsa fish, or as wild specimen contained in zoos with which we could satisfy our curiosity about distant lands and wildernesses. In none of these cases was the nonhuman—whether the recipient of certain beliefs about the sacred, whether the harbingers of happiness or whether as subjects of the budding naturalists' gaze—seen as sharing much with the human. They were seen as 'animals': decidedly inferior creatures when placed in some sort of hierarchy with humans. They were not 'equals'.

Initially, when I had first arrived and heard 'aren't we just tiger-food for you lot?' I had inscribed this question within the hierarchy I was familiar with—the one between humans and animals. I thought the young islander was in a way sarcastically responding to what he believed was the way I, a person from a city, viewed him as well as the rest of the Sundarbans islanders. He assumed I saw them in a hierarchy with wild animals and in that hierarchy we urbanites saw the wild animal, here the tiger, as more important than the humans of the Sundarbans. Yet, as the days went by, I was often urged to travel to the forest by the islanders. I kept being continually plied with stories from the forest so that 'I understood their tigers'. These stories about their tigers seemed to be based upon a belief that in the Sundarbans region in general, and in the Sundarbans Forest in particular, humans and nonhumans share

similar essences and that these similarities had more to do with a certain collective geography and a mutual history than with anything else. Indeed, tigers in the Sundarbans were not mere ‘animals’, they were endowed with so many human traits that I had to call them by a more appropriate term and decided, from them on, to call them ‘nonhumans’. This was also because for the islanders, in some sort, tigers were ‘equals’.

Harriet Ritvo (1987), Tim Ingold (1988), Philippe Descola (1992: 107–26; 1996), Viveiros de Castro (1996), Molly Mullin (1999), Adrian Franklin (1999), Nurit Bird-David (1999), Mahesh Rangarajan (2001), Rane Willerslev (2007), Haraway (2008), Harvey Neo (2012, 2016; with Yeo 2010; with Ngiam 2014), Alan Mikhail (2015) and in the South Asian sphere Mann Barua (2010, 2013), Annu Jalais (2010; 2018); Sivaramakrishnan (2015), Ambika Aiyadurai (2016), Radhika Govindrajan (2018), Yamini Narayanan (2018), Krithika Srinivasan (2019), show how people’s interactions with animals form the basis of both their social practices and their understandings of the social. For any one society, says Franklin, the ‘animal world’ is never seen as an indivisible category but as a historically constituted and morally loaded field of meanings that derives from the human habit of extending social logics, complexities and conflicts onto the natural world, and particularly onto nonhumans. If, following these authors, ideas of ‘nature’ are fundamentally intertwined with ideas of society, we need to address what ideas of society and it’s ordering become reproduced, excluded or validated through nature and nonhumans. Let’s take the case of the Sundarbans, what are nonhumans—especially forest-based ones—for the islanders? How are their ideas about these nonhumans intertwined with their ideas of themselves and others? Or how do the Sundarbans islanders make sense of their society through both their understanding of as well as their practical engagements with cows and tigers? In some narratives tigers were invested with the

human qualities of ‘understanding’ and ‘kindness’, whereas in others, they were understood to be vicious and cruel, the state’s killing machines. Cows on the other hand were gentle and kind, but not really seen as sacred even though most Hindu islanders, Dalit or otherwise, did not kill them for meat. If ideas of society and of its ordering become reproduced, legitimated, excluded, validated and so on, through appeals to nature, as Macnaghten and Urry (1998: 15) argue, the project which remains is that of determining what is a ‘nonhuman’ for the Sundarbans islanders and how do their ideas of the nonhuman tell us more about how they view themselves and others within their ecotone.

The Sundarbans islanders often explained that because the Sundarbans environment was tough, it had unified humans and nonhumans by investing them both with a common ‘cantankerousness’—a sort of an irritable, angry nature. Also, just as they saw the locale as influencing them and making them more ‘cantankerous’, they believed that history, especially the violence witnessed in the politics of the Sundarbans, had increased the harshness of their environment (Jalais 2005: 1758). In other words, the islanders explained that the growing violence of humans expressed through their polluting paraphernalia such as motorboats, prawn seed collectors’ mosquito nets and poachers’ rifles entering the forest, as well as the more dangerous political viciousness linked to the creeping divisions of caste and religion affected the locale of the forest, which in turn affected tigers and other non-humans’ need for peace and security. This made nonhumans more ferocious and increased the danger of working in the Sundarbans. The two (humans and non-humans), however, were ‘sealed’ together by the Sundarbans (Jalais 2010a: 198). Ethnographic studies based on South Asia have usually studied social collectives in relation to caste and religious distinctions. These are of course important analytical grids. But to truly understand the ‘ecotone’ that is the Sundarbans region, one needs

to do so through the social collective of the islanders. For the islanders, society and its divisions made more sense when looked at through the lens of the nonhuman than through caste or religion.

So where does caste fit into all of this? Caste remains the organizing principle of Indian society and often the main marker of division between people. As argued by Dipankar Gupta, the very act of according value to various caste groups endorses hierarchy—one which necessarily sees certain groups as diminished (2000). However, interestingly, one could argue that in the ecotonal zone of the Sundarbans caste distinctions between people are less marked and practiced. This is the case in other such 'ecotones' and I will give two examples of such ecotones close to home. The first is Sivaramakrishnan's study of a region that lies to the Sundarbans' north east called Midnapur. Through a detailed examination of colonial forestry plans and their implementation, Sivaramakrishnan, by drawing upon Foucault's notion of genealogy, looks at the interpenetration of the colonial state, local environment and indigenous communities and how these impacted each other (1999: 13–19). Another particularly apt description of an ecotone space is that of a region which lies to West Bengal's northwest and its 'frontier peasants' who brave very violent national borders with teacups and conversations highlighting shared conviviality (Sur 2016; 2019). Most researchers have made similar argument in relation to communities living in or near forests. These are often composed of Adivasis or the 'original settlers' who are organized along tribe lines and not caste lines. In the Sundarbans, there were four main communities, a) those of East Bengali origin and who belong to two of the lowest castes of Bengal, Pod and Namasudra, b) the Adivasis of Oraon and Munda origin, c) the Midnapuris so named because their origins are in Midnapur (mainly OBCs), and d) the Muslims from both the Sundarbans and areas in the North 24 Parganas outside the Sundarbans. The islanders maintain that the divisions

between these four communities are based on essential physical, cultural and psychological traits, yet they sometimes intermarry and share aspects of religious devotion. In fact, the ordering of social positions of the four groups is often locally specific and linked to each group's successes on particular islands. Hence the island one comes from, whether one lives nearer the mainland or amenities such as schools and hospitals, whether one is landed or one works in the forest, whether one has family in Kolkata and its vicinity or not, are all markers of social status (Jalais 2010: 50).

But if caste is not too important for communities living in close proximity to forests, caste, however, as Mukul Sharma argues, 'is one of the central categories that frames environmental politics'. Even though that may be the case, argues Sharma, there seems to be 'an environmental blindness on questions of caste' (Sharma 2012a: 46). In his book Green and Saffron: Hindu Nationalism and Indian Environmental Politics (2012b), Sharma links together environmentalism and Hindu nationalism. This discussion was really started a couple of decades back with Sinha, Gururani and Greenberg arguing that Indian environmentalism is often Brahminical, Hindu and conservative, and is couched in a language of 'new caste' and 'new traditionalism' (Sinha et al 1997). Studies such as those of Sinha et al (1997), Jalais (2005; 2010), Sharma (2012a, 2012b), Aiyadurai (2016), have looked at the ways in which caste, Hindutva and environmentalism mix. Through a study of present-day growing middle-class obsessions about nature tourism, banning beef-eating and eating sattvik or vegetarian food, leading lives sanctioned by Vedic principles of purity and pollution and believing that these are somehow superior ways of living, what happens in the process is the alienation of certain more subaltern 'ecotonal' practices and food habits. Through some of the contradictions between the commercial use of 'nature' amongst the Indian middle-class and that of subaltern

populations living in socio-cultural ecotones and their everyday use and symbolism of 'nature', I would like to highlight the deep contradictions between the two understandings of nature and nonhumans and by extension, the notion of the 'collective'.

One of the ways in which this chapter furthers Sharma's argument is to talk about the ways in which people think of non-vegetarian food and why environmental politics sits very uneasily with the politics of those living in ecotones such as the Sundarbans. The recent killings, mostly of Muslims and Dalits, over beef in India are very telling in relation to subaltern identities. The present right-winged National Democratic Alliance (NDA) Government [a coalition of right-winged political parties the largest of which is the Bharatiya Janata Party (BJP)], was in a quandary in September and October 2016. They were committed on the one hand to the hardline Hindu right such as the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and the Vishwa Hindu Parishad (VHP) that adheres to a rigid form of Brahminical Hinduism which leaves little room for subaltern identities living lives unprescribed by Brahminical norms. The cow as a political symbol and its protection as a rallying cry for extreme right-wing groups to get the Hindu-majority country to vote the Modi Government to power has a long history. One that took off during colonial times with the Cow Protection movement being at the root of much communal violence during British rule by giving its adherents 'a much wider influence' (Gupta 2001: 4295). Political parties like the RSS and the VHP focused on Hindu revivalism and started the process of building gaushalas or cowsheds in India (Lodrick 1981; 2008). Gaushalas, as argued Yang, became political spaces seen as 'sanctuaries' for cows from a sociocultural and religious 'other' (1980) implying that if one were a good Hindu one would not risk a cow's life. We just need to look at how the cow has been flaunted by the NDA government as 'Gaumata' or 'mother cow' and how

it can stand in for the mother and how killing it is tantamount to killing one's mother to understand that complexity of the cow as a political symbol (Van Der Veer 1994). What I want to argue is that a lot of the arguments around beef have to do with not just the supposed sacrality and purity of the cow and her symbol as a 'mother' but with the 'dirty' Dalit or Muslim body—'dirty' both because of the kind of work these communities are seen as engaging in as well as because of the food they consume (Ghassem-Fachandi 2009, 2012; Sen 2007; Hansen 1996).

The gripe over the cow and its consumption started getting media attention after an event that occurred the 21st of December 2015 when a Muslim man called Md Akhlaq living outside Delhi was killed for supposedly having beef in his fridge. When the police arrived, they did not go after the murderers but went to the fridge to retrieve the supposed piece of incriminating beef to have it forensically tested to find out if it was beef or not. It was not. But it was too late for Akhlaq who had been literally lynched to death and his son who had been so hurt that he lay in hospital. The news started circulating more the three days after it had occurred. Several Muslims were attacked and murdered by cow vigilantes. On none of these occasions did Narendra Modi, the current Prime Minister of India, call for the instigators of mob violence to be brought to justice and his BJP party later celebrated and garlanded many of the lynchers. Indeed, senior BJP leaders, including Union culture minister Mahesh Sharma, the chief ministers of Jharkhand and Haryana, minister of state Sanjeev Baliyan and others, have either soft-pedaled these crimes or provided oblique justifications for them. In July 2016, seven Dalits were severely beaten up whilst four amongst them were lynched, their bodies strapped to a moving car and beaten with chains in Una in the western state of Gujarat. A famous Indian scientist returned the honours he had received from the Indian Government and reiterated the fact that beef was in fact prescribed in Ayurvedic medicine and that Hindus used to

happily eat beef and sacrifice it to Vedic gods. The Una attack forced the resignation of Gujarat's Chief Minister Anandiben Patel and awoke the Prime Minister to the seriousness of the situation. Modi ostentatiously declared 'If you have a problem, if you feel like attacking someone, attack me, not my Dalit brothers. If you want to shoot anyone, shoot me, not my Dalit brothers' in a speech made in Hyderabad on 7th August, 2016. However, the attacks did not stop. By the end April 2019, the total tally of Muslim and Dalits lynched to death, mostly over beef, was fifty-five, and more than 300 had been brutally assaulted. [But not a single murderer has faced justice to date (mid-June 2019)]. The outbreak of violence at Una brought Dalit organisations together. Jignesh Mevani, a prominent Dalit leader from Gujarat, held a rally in which thousands came together vowing to refuse to clean the carcasses of dead cows. 'Your mother, your duty' was the byline. Trucks of cow carcasses were dropped in front of Government offices and for days they stayed there rotting as nobody from the other castes came forward to remove them.

Mukherjee writes in The Telegraph (27/6/18), 'Periodic lynchings—most of the victims are Muslims and Dalits—have succeeded in turning the consumption of certain kinds of food, essentially meat, into a criminal transgression. The morality and attendant violence concerning meat (. . .) are, undoubtedly, integral to the ideological project of transforming a pluralist nation into a majoritarian polity'. I'm not going to delve into the long literature on the importance of the cow in Hinduism and both the profane and sacred aspects of this creature (for a good historical account on the doctrinal analysis of the cow's sacrality in Hinduism read Korom 2000); what I'm going to focus on here is the link of the cow to caste. Ambedkar really hits the nail on the head when he makes two important arguments in relation to beef-eating and caste. The first is that even if in the Vedic period, 'for the Brahmin every day was a beef-steak day' (1948: 193) this is no longer the case and the second is that

with the abandoning of meat-eating by Brahmin communities, the meat of the dead cow now became the chief item of food consumed by communities which are generally classified as 'untouchable' (1948: 184). All untouchable communities have some relation to the dead cow—some eat the flesh, some remove the skin, some manufacture articles out of the cow's skin and bones. An easy way to understand caste hierarchy today is to see who eats beef—those who do are at the bottom of the caste pile, those who are non-vegetarians but do not eat beef are in between and those who are vegetarians are at the top. The majority of Dalits, for all kinds of reasons, refrain from beef-eating; but whether they eat it or not, the fact that they are potential beefeaters puts them in the category of the 'untouchable'. Even though the presumed 'holiness' of the cow in Vedism or ancient Hinduism is a myth as its flesh played an important part in the cuisine of ancient India, today its consumption is seen as Islam's 'baneful bequeathal' to India (Jha 2009). Indeed, beef is considered by the majority of middle-class Hindu India as something that is not part of Hindu culture and that it is 'foreign'—indulged in by Muslims and Christians, minorities often also called 'anti-nationals' by BJP supporters. Partha Chatterjee's formulations about nationalism are particularly relevant in this context. He argues that Indian nationalists in the mid- to late nineteenth century made a distinction between a material sphere of power, regarded as exterior to the individual, where the British were superior, and a spiritual sphere of moral value where 'traditional' Hindu beliefs, located within the individual, were regarded as superior to, and somewhat immune from, the Western culture of imperialism (Chatterjee 1989: 624). For Gandhi, control of the body was superior to brute masculinity and believed to be tied to the kind of food one ate. This alternative male body as studied by Ashish Nandy (1983), Partha Chatterjee (1989; 1994), Mrinalini Sinha (1995) in the context of the 'other' is one that focuses on the male middle-class that refrains from eating beef so as to be independent from the burden of colonialism.

The argument I want to raise, through this cow-caste politics, is how in the South Asian sphere, it is difficult to organise people around a common collective. Arvind Kejriwal and Anna Hazare tried in the summer of 2011 to create a common ground on the issue of corruption. But it was mainly Delhi-centric and based in a middle-class Brahminical culture. The BJP unapologetically upholds the ideology of the high caste. History books in a few states of India have erased passages on how bovine used to be both sacrificed and feasted on in ancient times. On a national level, the Modi Government is trying to enforce 'one cow'—the sacred 'Hindu cow', and those who dare resist, are termed 'anti-national', 'seditious' or seen as up for being lynched. This 'one Hindu cow' is sacred, pure, motherly, chaste. But if it is about protecting milch cattle why is the buffalo given no such status even though it provides seventy-five percent of India's milk, pertinently asks Kancha Ilaiah (2004: XXV). Similarly, foreign bulls get bad press. In 2016, the Haryana MP argued that foreign bulls had 'loose characters' and wanted to have sex anytime with the poor Indian cows who, he said, were on the contrary regulated, when it came to copulation, by seasons. The loose character of the foreign bulls undoubtedly reflected the character of the people from the foreign lands from which these bulls came. So, there is an entire taxonomy of caste in the way bovines are described and perceived. If native cows are 'burdened with representing Hindu purity' (Narayanan, 2018: 331), buffaloes are exposed to exploitation and oppression and represent the 'whole Dravidian, now Dalit-Bahujan, culture' (Ilaiah 2004: XXX), and foreign bulls are 'loose' and sexually promiscuous. As aptly argued by Shoma Sen, 'Indians are known to be publicly coy about sex, as the dominant Brahminical culture, coupled with the Victorian prudery of the colonial rulers, erased earthy Indian folk songs and dances, instead promoting the classical culture of the elite class' (2019: 42); a culture where sex is seen as something the superior person does not engage in or at least tries to control.

Being judged in relation to the kind of food one eats has become an effective way of policing citizens and those seen as minority 'anti-nationals'. The recent outcry by the Modi-Government condemning the fact that Durga puja in Bengal is an occasion for a veritable orgy of all kinds of food—most of them being non-vegetarian—became a huge issue in Kolkata. Trying to equate Durga puja as celebrated in Bengal with the festival of Navaratri as celebrated in Gujarat, many Modi-Government supporters said that it was shocking that while the 'rest of India' was fasting, Bengalis were feasting and that too on non-vegetarian fare. West Bengal is 99% non-vegetarian, however many Hindus are vegetarian on certain days of the week or some women when they become widows. How could, in these circumstances, Bengalis argued, Durga puja, which is the celebration of the coming of goddess Durga as a daughter returning to her father's home with her four children, be a time for sadness (as vegetarianism is mainly equated to the sadness of widowhood)? Durga isn't a widow so she couldn't be served vegetarian food, and neither could the rest of the population celebrating in the joy of having her back 'home'. But what the Hindutva brigade tries to do, through these repeated assaults on peoples' eating habits is a kind of 'shaming'. As astutely observed by Mukherjee in his article in The Telegraph on the dish haleem,

The spectre of Hindutva nourishes itself on the idea of shame. Shame functions as a double-edged sword in this enterprise. It is demanded of Hindus for their alleged enfeeblement, the figment of a jaundiced imagination. Hindutva also seeks to shame its opponents—democrats, rationalists, liberals, Dalits, leftists—for their efforts to engage with the demonized. That the shaming has been effective can be gauged from the emergence of insular communities. (June 27, 2018)

Communities that have, in the last few years, stopped sharing in each other's cultures, dishes, songs and stories. As Veena Das has said, 'images of hate between

social groups may take a volatile form when the social order is threatened by a critical event and so transform the world that the worst becomes not only possible but also probable' (1998: 126). Indeed, India has recently also seen a spate of public attacks, both in rural as well as in urban spaces, on migrants or travellers seen as 'child kidnappers' or 'love-jihadists' (the term used by radical Hindutva groups to target Muslim men who have married or are in a relationship with Hindu women); many have been lynched to death. As argued by Atreyee Sen, a lot of the public paranoia around women and rape in India today has to do with both a cultural history about the threat of the sexual conquest of Hindu women by the 'other' as well as a discourse by the global Right that pitches the migrant (in the West oftentimes synonymous with Muslim) as rapist (2019: 747). It is in this scenario that ethnographies of 'ecotonal subalterns' that share a sense of 'religiously-prescribed brotherhood' (as exemplified by the exhortations made by Bonbibi as written in the booklet read out during her ritual veneration) between communities, becomes important as they challenge the status quo of the dominant and violent conservative group. What I'm arguing in the case of both the Sundarbans and Kolkata, is that today's modern environmental rhetoric is often based on ideas of tradition that do not necessarily sit very comfortably with ideas of a pan-Bengal transcending Bengali subaltern identity that does not care for the more Brahminical strictures of caste and religion. In the West, today, the bombast is about protecting the remaining 'wilderness': natural forests, highlands, moorlands and wetlands. Other natures closer to cities are seen as 'denatured', 'unclean' or 'lost' and are not fought for in the same way. The environmental movement in the West started off a bit like the Romantic movement which privileged similar types of pristine natures and led by similar kinds of people–the educated middle classes. Sharing parallels with the start of the environmental movement in the West, in South Asia, specifically in India, the Green movement has a lot of tie-ups with right-wing politics (as argued by Sharma

2012b, Gururani et al 2014). In an article on Ayurveda, Alter argues that for the Indian middle-classes, 'advocacy for nature cure is, in many ways, an expression of indigenous dehati (rural or rustic) or deshi (local, as distinct from videshi, foreign) cosmopolitanism' (2015: 14). Similarly, the environmental initiative led by Anna Hazare in a place called Ralegan Siddhi was autocratic and bereft of diversity and social justice. It did not include shared ideals and banned consuming beef or alcohol—practices which end up excluding subaltern communities. Be it though the growing fashion of karva chauth fasting where married women fast for the well-being of their husbands, the practice of astrology for gaging the suitability of a potential marriage partner, of centres to help couples have 'designer babies' (Sur 2018), or by-products (such as those by Patanjali, Dabur India ltd, Sri Sri Ayurveda), etc., believed to be 'natural' and ancient and therefore beneficial for the body, there is a certain emergence of an Indian middle-class revivalism of 'ancient nature' which in turn valorises ideas of caste and old-fashioned gender roles. How otherwise can we explain the high number of educated middle-class women who stay at home to rear children in India today? How to explain that despite the Swachh Bharat Mission (a nation-wide campaign to supposedly 'clean' India's streets, roads and cities in general) practically nothing has been done for manual scavengers who still die by the hundreds while manually cleaning dry toilet in insalubrious conditions. Is this traditionalism, steeped in Vedic notions of caste and gender hierarchies, a new way of finding meaning in a post-weberian world? Or are these subtle ways of transforming the self to help build a 'Hindu nation'—one very closely attuned to a certain kind of Brahminical Hinduism—with little space for dissident, non-Savarna, ecotonal subalterns' voices and practices?

There is interest, amongst the Indian middle-class (only about 10% of the population of India) for example, at 'preserving nature' and nonhumans for tourism, for eco-

parks, for recreation have been very neoliberal with nature commodified and nonhumans only valorised for the visual consumption they offer as pertinently argued by Vasan (2018). Very little has been done to safeguard the rights of those who have been living in close proximity to natural landscapes and who, by default, have been its champions. What is now dominating Indian politics is the reinsertion of caste within arguments for ecological/environmental rights in relation to the Governments' so to speak enforced vegetarianism and its dismally poor support towards farmers and the poor in general. As Mukul Sharma has argued, 'with a few exceptions, Indian environment studies are 'caste blind' (Sharma 2012a). What one needs to remember in the case of the Sundarbans, for example, are the engaged ways in which the subaltern communities think and relate to nonhumans and their 'ecotonal' traditions when it comes to shared religious practices. In a way, these are very much in sync with the redemption offered via the collective movements that were the Bhakti or the Sufi strains of religious experience in the South Asia of the 16th century or later through the movements such as the Matua religion (Bandyopadhyay 2004). Rising against the Brahmin priests' organized ritual performance and Savarna ethics of hierarchy based on purity and pollution, the Bhakti movement asserted that emotional enthusiasm or and treating everyone with respect was perhaps a better way of attaining emancipation from the miseries of human existence. The term bhakti is loosely translated as 'devotion', but its meaning is more complex. 'Bhakti comes from the verb root bhaj. In its earliest usage, bhaj means divide or share, as one divides and partakes of the sacrificial offerings' (Davis, 1995: 29). The later Bhakti movements that began in the 12th century and continued through the seventeenth centuries in the Deccan and throughout northern India really brought a sense of 'collective' based in 'equality' (Davis 1995). In some way, these collective struggles ushered the notion of the 'collective' via the message of equality and redemptive hope. I do not propose here a culturalist idealisation of

community but an exploration of how ‘a collective can represent itself as a community through shared experiences of marginalization as well as subject-formation’ (Sen and Pattanaik 2018: 1). As argued by Nixon, we live in an era of increasingly elaborate global entanglements that we need to engage with in relation to the wide spectrum of what counts as environmentalism in different parts of the world as this gives us the opportunity to generate vital new forms of storytelling alongside fresh interdisciplinary perspectives on some of the most challenging concerns of our time (2013). And this is why stories of how nonhumans are perceived by the Sundarbans subaltern ecotonal collective make sense. As Subir Sinha argues, the ways in which subaltern communities understand domination, oppression, and exploitation on their own terms, rather than only through a lens exterior to subaltern consciousness offers new transgressive ways of understanding nature in the South Asian realm. ‘In hitching their demands for rights to nature to “universalist” notions of law, science, and solidarity, subalterns both uphold and subvert universalism. As subalterns become intelligible to powerful others, and as they make power intelligible to themselves, the domains from which they are excluded themselves get transformed, as does subalterneity itself’ (94–96). I am, however, not as optimistic as Sinha. It is not as if the cultural engagements with nonhumans of these ‘ecotonal collectives’ are recognized or respected. Frederic Landy has made an important observation in that what he calls groups with ‘eco-ethnic identity’ and how that get recognised only when ‘flamboyant’ (such as that of the Maasai for example) as opposed to those seen as un-iconic (such as the Adivasis of India).

I would like to conclude with recent subaltern ethnographic examples from South Asia that have allied both scholarly and public writing on environmental concerns with those on social movements. It is of course important, as argues Kashwan, to

enter into partnerships and a genuine dialogue with forest rights movements because of the historical legacy of exclusionary conservation (2013) but one needs to ally it to other subaltern movements and literatures (such as the exegesis on myths offered by Doniger 1988). As argued for Dalit literature, the importance of having an in-depth contextual knowledge cannot be downplayed (Thiara and Misrahi-Barak 2019; Lorea 2016). In Kandhamal, Arpitha Kodaveri learnt that sacred groves were being demarcated based upon the customary practices of the Kondhs, who upon conversion to Hinduism took on a different understanding of sacredness where Dalits were excluded from such cultural pockets (Kodiveri 2016). Ambika Aiyadurai has made a similar observation in Arunachal Pradesh (2016). The different ways of understanding our world are linked to ways of understanding our purpose in it. In a way, the politicised Hindutva middle class regulate, control, protect what they have come to see as 'their world' and this is distinct from a position where subaltern groups from ecotones see themselves as part of a whole collective, one not ours to regulate, control, protect but one to experience and try make sense of.

References

*****

Authors

ধ্রুবা দাশ গুপ্ত

ধ্রুবা দাশ গুপ্ত পূর্ব কলকাতার ময়লা জলের জলাভূমি সমাজের মুখপাত্র হবার ইচ্ছে পোষণ করেন। কলকাতা শহরকে ধরে রাখা এই একগুচ্ছ উৎপাদনকারী গ্রাম এবং উপভোক্তা নগরবাসীদের বিপরীতধর্মী চিন্তাধারার গতিমুখ পাল্টে কি করে একটা ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় যাতে গ্রামও বাঁচে আবার শহরও থাকে, এই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এই কাজে তাকে ব্রতী করেছিলেন তার প্রয়াত শিক্ষক ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ। বর্তমানে ধ্রুবা IIEST Shibpur-এ (তৎকালীন Bengal Engineering College) Civil Engineering বিভাগে এই জলাভূমিকে নিয়েই গবেষণা করেন। দুই দশকেরও বেশী এই সমাজের সঙ্গে পরিচিতির ফলে এদের হয়ে কাজ করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও সম-ভাবাপন্ন মানুষদের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনা করেন তিনি। এই প্রতিষ্ঠানের নাম Society for Creative Opportunities and Participatory Ecosystems (www. scopekolkata.org)

Debojyoti Das

Debojyoti Das is an Anthropologist of South Asia focusing on the borderlands of Eastern India and the India Ocean world. He is the author of the book The Politics of Swidden Farming: Environment and Development in Eastern India (2018) and is the recipient of the 2018-19, Social Science Research Council, US, Inter Asia Context and Connections New Paradigm Grant. He has held fellowships at Yale, Bristol, University of Sussex and University of London.

গৌরাঙ্গ নন্দী

গৌরাঙ্গ নন্দী তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে মাঠ পর্যায়ে সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর খুলনায় জন্ম, লেখাপড়া ও সেখানে থেকেই কাজ করা। বর্তমানে ঢাকা হতে প্রকাশিত দৈনিক কালের কণ্ঠ-এর খুলনা ব্যুরো প্রধান হিসেবে কর্মরত। সুন্দরবন সংলগ্ন খুলনা অঞ্চলটি

জলাবদ্ধতা, নদী শুকিয়ে যাওয়া, ঘূর্ণিঝড়, নোনা পানির চিংড়ি চাষের কারণে মাটি ও পানির লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমূদ্রের জল-স্তর বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি। যে কারণে এসব বিষয়ের উৎসাহী পর্যবেক্ষক, পাঠক ও লেখক। লেখালেখির মূল বিষয় পরিবেশ, সমাজ এবং মুক্তিযুদ্ধ। এসব বিষয়ে বারোটি গ্রন্থের রচয়িতা।

Nairwita Bandyopadhyay

Dr.Nairwita Bandyopadhyay is a geographer by profession and researcher by passion. She firmly believes that a change in paradigm is needed on how we perceive climate change and a pro-active approach can change the way people respond in crisis situations. She has training in climatology and satellite image interpretation for more than ten years but also feels that field observations and behavioural responses of people on ground are important in studying risk assessment as it is difficult to convince a layman about modern day weather forecasting.

ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ধুর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬২, ১৯৮২-তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। অরণ্য ও প্রকৃতি সংরক্ষণে প্রযুক্তির প্রয়োগে উৎসাহী। ১৯৯৫ থেকে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভাষা প্রকাশের যন্ত্র ‘কথামালা’ র গবেষণা ও ক্রমাগত উন্নয়নে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পালসির সঙ্গে জড়িত। পুরুলিয়ার ‘ভালোপাহাড়’ সংগঠনের কর্মী। ‘প্রকৃতি ভালোপাহাড়’ নামে অরণ্য ও সংরক্ষণ বিষয়ক পত্রিকার প্রকাশক।

Vasundhara Bhojvaid

Dr. Vasundhara Bhojvaid is Assistant Professor at the Department of Sociology, Shiv Nadar University, India. Vasundhara’s current work looks at how air pollution is affecting and being affected by policies, transforming life in urban spaces

and understandings of the body. This is informed by her broader interests in how air pollution has close intersections with climate change and is charting new ways in which to anthropologically explore the contemporary. Her articles have appeared in The Journal of Material Culture and Cultural Anthropology.

Ankit Prasad

Ankit Prasad is interested in speculative fiction, Indian literary cultures, and translation. He is currently pursuing a PhD at The EFL University, Hyderabad.

Annu Jalais

Annu Jalais is an environmental anthropologist (currently at the National University of Singapore) who will be based as Associate Professor at Krea University from January 2022. Her interdisciplinary research and teaching experience focuses on: the human – nonhuman interface; environment and climate change; religious identity and migration; caste and social justice. Annu is well-known for her scholarship on the Sundarbans, its people, forests and ecological terrain. Her books 'Forest of Tigers: People, Politics and Environment in the Sundarbans' (2010) and (co-authored) 'The Bengal Diaspora: Rethinking Muslim Migration' (2016) on the partition of Bengal and its aftermath are essential reading for anyone interested in the ethnography of Bengal.

References

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি –শৌচ তথা নিকাশী ব্যবস্থা, কারিগরি বিদ্যা এবং ইকোলজির সমন্বয় সাধন

1. Ashgar Ally vs Dr. Birendra Nath Dey on 27 March, 1945. See http://indiankanoon.org/doc/2835/ (accessed on 14 April 2019)
2. Bagchi K (1944) *The Ganges Delta.* University of Calcutta, Calcutta, India.
3. Banerjee B and Ray A (1959) Reclamation of the Salt Lakes of Calcutta. *Science and Culture,* 25 (4): 227-231.
4. Banerjee H (2018) *History of Canals in Bengal.* Doshor Publications, Kolkata, India.
5. Basu NB, Dey A and Ghosh D (2013) Kolkata's brick sewer renewal: history, challenges and benefits. *Proceedings of ICE – Civil Engineering* 166(2): 74–81
6. Bose PC (1944) Calcutta Sewage and Fish Culture. *Proceedings of the National Institute of Sciences, India* 10 (4): 443-454.
7. Chatterjee M (1990) Town Planning in Calcutta – Past, Present and Future. *Calcutta: The Living City, Vol II* (ed. S Chaudhuri). OUP, Calcutta, India.
8. Calcutta Municipal Gazette (1929) *The Drainage Outfall Problem of Calcutta.* Central Municipal Office, Calcutta, India.
9. Calcutta Municipal Gazette (1932a) *Calcutta's Outfall Crisis: Corporation Executives Call for Action.* Central Municipal Office, Calcutta, India.
10. Calcutta Municipal Gazette (1932b) *Prevention of Street Flooding During Rainfall.* Central Municipal Office, Calcutta, India.
11. Calcutta Municipal Gazette (1937) *The Proposed Extension of Calcutta's Drainage.* Central Municipal Office, Calcutta, India.
12. Calcutta Municipal Gazette (1943) *Calcutta Improvement Trust During 1942-43.* Central Municipal Office, Calcutta, India.
13. Calcutta Municipal Gazette (1944) *Calcutta's Drainage Problem.* Central Municipal Office, Calcutta, India.

14. Calcutta Municipal Gazette (1945a) *Supersession Threat to the Corporation*. Central Municipal Office, Calcutta, India.
15. Calcutta Municipal Gazette (1945b) *Some Facts about Calcutta Drainage*. Central Municipal Office, Calcutta, India.
16. Calcutta Municipal Gazette (1946) *Grow More Food Campaign*. Central Municipal Office, Calcutta, India.
17. Calcutta Municipal Gazette (1947) *Dr Dey's Kulti Outfall Scheme*. Central Municipal Office, Calcutta, India.
18. Calcutta Municipal Gazette (1958) *Budget Estimates for 1959-60*. Central Municipal Office, Calcutta, India.
19. Calcutta Municipal Gazette (1959) *Calcutta's Water Supply and Drainage*. Central Municipal Office, Calcutta, India.
20. Census of India (1901) Report (Statistical) – Calcutta Town and Suburbs. Vol VII, Part IV. Bengal Secretariat Press, Calcutta, India.
21. Census of India (2011) https://www.census2011.co.in/census/city/215-kolkata.html, accessed on 16 April 2019
22. Chattopadhyaya (1990) *From Marsh to Township East of Calcutta*. KP Bagchi and Company, Calcutta, India.
23. CMPO (Calcutta Metropolitan Planning Organisation) (1966) *Master Plan for Water Supply, Sewerage and Drainage: Calcutta Metropolitan District 1966–2001*. CMPO, Calcutta, India.
24. Corporation of Calcutta vs Hindusthan Construction Co. Ltd. on 1 March, 1972. See https://indiankanoon.org/doc/571640/ (accessed on 4 May 2019)
25. Corporation of Calcutta (1946) *Selection of Records on Dr Dey's Kulti Outfall Scheme (1930-1945)* See http://www.southasiaarchive.com/Content/sarf.140629/201335 accessed on 13 June 2019
26. Das Gupta D, Chaudhuri S and Ghosh S (2017) *Not a Single Bill Board: The Shifting Priority in Land Use within the Protected Wetlands to the East of Kolkata*. Society for Creative Opportunities and Participatory Ecosystems, Kolkata, India.

27. Dey A (2015) Calcutta's Sanitation Heritage: A Unique Engineering Legacy. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Engineering History and Heritage* 168(3): 101–112, https://doi.org/10.1680/ehah.14.00006.
28. Dey K (2017) Present Status of Sewage-fed Irrigation and Need for Improvement in the East Kolkata Wetlands. *Workshop on East Kolkata Wetlands: Record of Proceedings.*
29. DEC (1945) Report of the Committee to Enquire into the Drainage Condition of Calcutta and Adjoining Areas, Bengal Government Press, Calcutta, India.
30. Fever Hospital Committee (1840) Abridged Extract from the Report of the Committee for the Establishment of a Fever Hospital, and for Inquiring into Local Management and Taxation in Calcutta. Bishop's College Press, Calcutta, India.
31. Fever Hospital Committee (1846) Second Report of the Committee for the Establishment of a Fever Hospital, and for Inquiring into Local Management and Taxation in Calcutta. Bishop's College Press, Calcutta, India.
32. Fever Hospital Committee (1848) Appendix H, Appendix to Appendix H and Appendix J of the Second Report of Fever Hospital Committee for the Establishment of a Fever Hospital, and for Inquiring into Local Management and Taxation in Calcutta. Bishop's College Press, Calcutta, India.
33. Ghosh D and Das Gupta D (2015) *Making Conservation an Inclusive Agenda: Perception Survey and Familiarisation Studies in the East Kolkata Wetlands.* ICSSR, Eastern Regional Centre, Kolkata, India.
34. Ghosh D (2005) *Ecology and Traditional Wetland Practice: Lessons in Wastewater Utilisation in the East Calcutta Wetlands*. Worldview, Kolkata, India.
35. Ghosh D and Sen S (1987) Ecological History of Calcutta's Wetland Conversion. *Environmental Conservation,* 14 (3): 219-226.
36. Goode SW (1916) Municipal Calcutta: Its Institutions in their Origin and Growth. T and A Constable, Edinburgh, UK. Reprinted in 2005 by Kolkata Municipal Corporation and MacMillan, New Delhi, India.
37. Inglis WA (1909) *The Canals and Flood Banks of Bengal,* Calcutta, The Bengal Secretariat Press, reprinted in 2002, compiled by Kumud Ranjan Biswas, *'Rivers of Bengal: A Compilation',* V, West Bengal District Gazetteers, Government of West Bengal, Kolkata.

38. Krishnan Nair K (1944) Calcutta Sewage Irrigation Fisheries. *Proceedings of the National Institute of Sciences, India* 10 (4): 459-462.
39. Majumdar SC (1941) *Rivers of the Bengal Delta*. Bengal Government Press, Calcutta.
40. Martin JR (1837) *Notes on the Medical Topography of Calcutta.* H. Huttmann, Bengal Military Orphan Press, Calcutta, India.
41. Mukherjee R (1938) *The Changing Face of Bengal: A Study in Riverine Economy.* University of Calcutta, Calcutta, India.
42. Nandy S (1948) *Bengal Rivers and Our Economic Welfare*. The Book Company Limited, Calcutta, India.
43. O'Malley LSS (1914) *Bengal District Gazetteers: 24 Parganas*. The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, India.
44. Pal D and Das Gupta C (1992) Microbial Pollution in Water and its Effect on Fish. *Journal of Aquatic Animal Health*, 4:1, 32-39, DOI:
45. 10.1577/1548-8667(1992)004<0032:MPIWAI>2.3.CO;2
46. Paul A (2009) Assessment of Waterlogging in CMC and its Social Impact (PhD thesis). University of Calcutta, Kolkata, India.
47. Phuntso S, Shon HK, Vigneswaran S and Kandasamy J (2009) Wastewater Stabilization Ponds (WSP) for Wastewater Treatment in *Water and Wastewater Treatment Technologies (Vol. II)*, EOLSS Publishers/ UNESCO, Oxford, UK.
48. Ray AK (1902) *A Short History of Calcutta – Town and Suburbs.* Census of India, Vol VII, Part I. Bengal Secretariat Press, Calcutta, India.
49. Saha A (1998) Survival of Calcutta Metropolis with special reference to Bhagirathi-Hooghly and Bidyadhari rivers, *Construction Engineers of India,* Journal of State Engineers' Association, West Bengal.
50. Sarkar S, Ghosh PB, Mukherjee K, Sil AK and Saha T (2009) Sewage treatment in a single pond system at East KolkataWetland, India. *Water Science and Technology* 60 (9): 2309-2317
51. Spuhler D (2019) Waste Stabilisation Ponds. adapted from *Compendium of Sanitation Systems and Technologies* (2nd Revised Edition) See https://sswm.info/factsheet/waste-stabilisation-ponds, accessed on 10 June 2019

52. World Bank (2001) *World Bank Study Report on World Bank Project No. PO-50648 Water Supply, Sewerage and Drainage Project Prepared for Calcutta Municipal Corporation*. World Bank, Washington, DC, USA.
53. WWAP [United Nations World Water Assessment Programme] (2017) *The United Nations World Water Development Report 2017. Wastewater: The Untapped Resource*. Paris, UNESCO.

*****

পরিবেশগত উদ্বাস্তু: বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন জনপদে মানুষের ঢেউ

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_migration
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_migrant
3. https://news.un.org/en/story/2009/09/314672
4. https://bn.wikipedia.org/wiki/নদীভাঙন

*****

Clifi: A Polemic

1. Barnett, David. “Science Fiction: The Genre That Dare Not Speak Its Name.” The Guardian, 28 January, 2009. https://www.theguardian.com/books/booksblog/2009/jan/28/science-fiction-genre.
2. Flynn, Adam. “Solarpunk: Notes Towards a Manifesto.” Hieroglyph, 4 September, 2014. https://hieroglyph.asu.edu/2014/09/solarpunk-notes-toward-a-manifesto/.

3. Ghosh, Amitav. The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable. U of Chicago P, 2016.
4. Goodbody, Axel, and Adeline Johns-Putra. Cli-Fi: A Companion. Peter Lang, 2018.
5. Mathew, Varun Thomas. The Black Dwarves of the Good Little Bay. Hachette India, 2019.
6. Moylan, Tom, and Raffaella Baccolini, eds. Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination. Psychology Press, 2003.
7. Nixon, Rob. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard U P, 2011.
8. Singh, Vandana. "Indra's Web." Ambiguity Machines and Other Stories. Zubaan, 2018.
9. Singh, Vandana. "Requiem." Ambiguity Machines and Other Stories. Zubaan, 2018.
10. Singh, Vandana. "Reunion." The Gollancz Book of South Asian Science Fiction. Edited by Tarun K. Saint. Hachette India, 2019.
11. Singh, Vandana. "The Unthinkability of Climate Change: Thoughts on Amitav Ghosh's The Great Derangement." Strange Horizons, 2017. http://strangehorizons.com/non-fiction/reviews/the-unthinkability-of-climate-change-thoughts-on-amitav-ghoshs-the-great-derangement/.
12. Slovic, Scott. The Fourth Wave of Ecocriticism: Materiality, Sustainability, and Applicability. https://sunrise-n.com/transatlantic_ecology/wp-content/uploads/2016/09/SlovicThe-Fourth-Wave-of-Ecocriticism.doc.pdf.

*****

The Human And The Nonhuman: 'Socio-Environmental' Ecotones And Deep Contradictions In The Bengali Heartland

1. Aiyadurai, Ambika. '"Tigers are Our Brothers": Understanding Human-Nature Relations in the Mishmi Hills, Northeast India'. *Conservation and Society* 14: 4 (2016): 305–316.

2. Alexander, Claire, Joya Chatterji and Annu Jalais. *The Bengal Diaspora: Rethinking Muslim Migration*. London, New York, New Delhi: Routledge, 2016.
3. Alter, Joseph S. 'Nature Cure and Ayurveda: Nationalism, Viscerality and Bio-ecology in India'. *Body & Society* 21: 1 (2015): 3–28.
4. Ambedkar, Bhimrao. *Untouchables: Who were they and why they became Untouchables*. New Delhi: Amrit Book Company, 1948.
5. Bandyopadhyay, Shekhar. *Caste, Culture and Hegemony: Social Dominance in Colonial Bengal*. New Delhi: Sage, 2004.
6. Banerjee, Sumanta. *Logic in a popular form: essays on popular religion in Bengal*. Calcutta: Seagull Books, 2002.
7. Barua, Mann. 'Whose issue? Representations of human–elephant conflict in Indian and international media', *Science Communication* 32 (2010): 55–75.
8. Barua, Mann. "Volatile Ecologies: Towards a Material Politics of Human-Animal Relations," *Environment and Planning* 46: 6 (2013): 1462–78.
9. Bird-David, Nurit. '"Animism" revisited: Personhood, Environment, and Relational Epistemology'. *Current Anthropology* 40: S1 (1999): S67–S91.
10. Chatterjee, Partha. 'Colonialism, Nationalism, and Colonialized Women: The Contest in India'. *American Ethnologist* 16: 4 (1989): 622–633.
11. Chatterjee, Partha. *The Nation and its Fragments*. Delhi: Oxford University Press, 1994.
12. Chaudhuri, Supriya. 'The Nation and Its Fictions: History and Allegory in Tagore's Gora'. *South Asia: Journal of South Asian Studies* 35: 1 (2012): 97–117.
13. Cohen, Robin. *Global Diasporas: An Introduction*. Seattle: University of Washington, 1997.
14. Das, Veena. 'Specificities: Official Narratives, Rumour, and the Social Production of Hate'. *Social Identities* 4: 1 (1998): 109–30.
15. Davis, Richard. 'Introduction', in *Religions of India in Practice*, Donald J. Lopez, ed. Princeton: Princeton University Press, 1995; 3–51.
16. Descola, Philippe. 'Societies of nature and the nature of society', in *Conceptualizing Society*, Adam Kuper, ed. London: Routledge, 1992; 107–26.

17. Descola, Philippe. ‘Constructing natures: symbolic ecology and social practice’, in *Nature and Society: Anthropological Perspectives*, Philippe Descola & Gísli Palsson, eds. London: Routledge, 1996.
18. Doniger, Wendy. *Other peoples’ myths: the cave of echoes*. Chicago: The University of Chicago, 1988.
19. Dutta roy, Sonali. ‘Hindu-Islamic Folk Goddess in Begal: Bonbibi’. *The Apollonian* 4: 1–2 (2017): 66–74.
20. Franklin, Adrian. *Animals and Modern Culture: A Sociology of Human-Animal Relations in Modernity*. London: Sage, 1999.
21. Ghassem-Fachandi, Parvis. ‘The Hyberbolic Vegetarian: Notes on a Fragile Subject in Gujarat’, in *Being There: The Fieldwork Encounter and the Making of Truth*, John Borneman and Abdellah Hammoudi, eds. Berkeley, CA: University of California Press, 2009; 77–112.
22. Ghassem-Fachandi, Parvis. *Pogrom in Gujarat: Hindu Nationalism and Anti-Muslim Violence in India*. Princeton: Princeton University Press, 2012.
23. Govindrajan, Radhika. *Animal Intimacies: Interspecies Relatedness in India’s Central Himalayas*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
24. Gupta, Charu. ‘The icon of mother in late colonial North India: “Bharat mata”, “matri bhasha” and “gau mata”’. *Economic and Political Weekly* 36: 45 (2001): 4291–99.
25. Gupta, Dipankar. *Interrogating Caste: Understanding Hierarchy and Difference in Indian Society*. New Delhi: Penguin Books India, 2000.
26. Hansen, Thomas Blom. ‘Recuperating Masculinity: Hindu Nationalism, Violence and the Exorcism of the Muslim “Other”’, *Critique of Anthropology* 16: 2 (1996): 137–72.
27. Haraway, Donna. *When Species Meet*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
28. Ilaiah, Kancha. *Buffalo Nationalism: A Critique of Spiritual Fascism*. New Delhi: Sage, 2004.
29. Ingold, Tim. *What is an Animal?* London: Unwin Hyman Ltd., 1988.
30. Jalais, Annu. ‘Dwelling on Morichjhanpi: When Tigers Became ‘Citizens’, Refugees ‘Tiger-Food’’. *Economic and Political Weekly* 40: 17 (2005): 1757–1762.
31. Jalais, Annu. ‘The Sundarbans: Whose World Heritage Site?’, *Conservation and Society* 5: 4 (2007): 1–8.

32. Jalais, Annu. ‘Unmasking the Cosmopolitan Tiger’, *Nature and Culture* 3: 1 (2008): 25–40.
33. Jalais, Annu. *Forest of Tigers: People, Politics and Environment in the Sundarbans*. New York, London, New Delhi: Routledge, 2010a.
34. Jalais, Annu. ‘Braving Crocodiles with Kali: Being a prawn-seed collector and a modern woman in the 21st century Sundarbans’, *Socio-Legal Review* 6: 1 (2010b): 1–23.
35. Jalais, Annu. ‘Reworlding the ancient Chinese tiger in the realm of the Asian Anthropocene’, *International Communication of Chinese Culture*. Vol. 5, Issue 1–2 (May 9, 2018): 121–144.
36. Jalais, Annu. ‘Geographies and Identities: Subaltern Partition Stories along Bengal’s Southern Frontier’. In *Borderland Lives in Northern South Asia*, ed. by David N. Gellner. Durham, NC: Duke University Press: Durham, 2014.
37. Jha, Dwijendra Narayan. *The Myth of the Holy Cow*. New Delhi: Navayana, 2009.
38. Jones, Reece. ‘Dreaming of a Golden Bengal: Discontinuities of Place and Identity in South Asia’. *Asian Studies Review* 35: 3 (2011): 373–395.
39. Kabir, Ananya Jahanara. *Partition’s post-amnesias: 1947, 1971 and modern South Asia*. New Delhi: Women unlimited, 2013.
40. Kashwan, Prakash. ‘The politics of rights-based approaches in conservation’, *Land Use Policy* 31 (2013): 613–626.
41. Kodiveri, Arpitha. ‘Changing Terrains of Environmental Citizenship in India’s Forests’. *Socio-Legal Review* 12: 2 (2016): 74–104.
42. Korom, Frank J. ‘Holy cow! The Apotheosis of Zebu, or why the cow is sacred in Hinduism’. *Asian Folklore Studies* 59: 2 (2000): 181–203.
43. Landy, Frédéric. ‘“Eco-ethnic identity”: Being an indigenous agriculturist in Nairobi and Mumbai national parks’, *Environmental Development* 10 (2014): 68–83.
44. Lodrick, Deryck O. *Sacred cows, sacred places: Origins and survival of animal homes in India*. Berkeley: University of California Press, 1981.
45. Lodrick, Deryck O. ‘Goshalas’. In *Enclyclopedia of religion and nature,* vol. 1, ed. Bron Taylor. London: Continuum, 2008.
46. Lorea, Carola Erika. *Folklore, Religion and the Songs of a Bengali Madman: A Journey between Performance and the Politics of Cultural Representation*. Jerusalem Studies in

Religion and Culture. Guy Stroumsa & David Shulman, eds. Vol. 22. Leiden, Boston: Brill, 2016.

47. Macnaghten, Phil & Urry, John. *Contested Natures*. London: Sage, 1998.
48. Mikhail, Alan. 'A Dog-Eat-Dog Empire: Violence and Affection on the Streets of Ottoman Cairo', *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle-East*, 35: 1 (2015): 76–95.
49. Mukherjee, Uddalak. 'Haleem Mubarak: When a dish is a recipe for both assimilation and exclusion' *The Telegraph*, June 27, 2018.
50. Mullin, Molly. 'Mirrors and Windows: Sociocultural Studies of Human–Animal Relationships'. *Annual Review of Anthropology* 28 (1999): 201–224.
51. Nandy, Ashis. *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonialism*. New Delhi: Oxford University Press, 1983.
52. Narayanan, Yamini. 'Cow Protection as 'Casteised Speciesism': Sacralisation, Commercialisation and Politicisation'. *South Asia: Journal of South Asian Studies* 41: 2 (2018): 331–351.
53. Neo, Harvey. 'Ethical Consumption, meaningful Substitution and the Challenges of vegetarian advocacy', *The Geographical Journal* 182: 2 (2016): 201–212.
54. Neo, Harvey & J.Z. NGIAM. 'Contesting captive cetaceans: (il)legal spaces and the nature of dolphins in urban Singapore', *Social & Cultural Geography* 15: 3 (2014): 235–254.
55. Neo, Harvey. '"They hate pigs, Chinese farmers . . . everything!" Beastly Racialization in Multiethnic Malaysia', *Antipode* 44: 3 (2012): 950–970.
56. Nixon, Rob. *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Boston: Harvard University Press, 2013.
57. Pratt, Mary Louise. 'Arts of the Contact Zone'. *Profession* (1991): 33–40.
58. Rangarajan, Mahesh. *India's Wildlife History*. Delhi: Permanent Black, 2001.
59. Ritvo, Harriet. *The Animal Estate: The English and Other Creatures*. Boston: Harvard University Press, 1987.
60. Sen, Amrita, and Sarmistha Pattanaik. 'A paradox of the "community": contemporary processes of participatory forest conservation in the Sundarban Biosphere Reserve (SBR) region of West Bengal', *Environmental Sociology* (2018): 1–14.

61. Sen, Atreyee. '"Teach Your Girls to Stab, Not Sing": Right-Wing Activism, Public Knife Distribution, and the Politics of Gendered Self-Defense in Mumbai, India', *Journal of Women in Culture and Society* 44: 3 (2019): 743–770.
62. Sen, Atreyee. *Shiv Sena Women: Violence and Communalism in a Bombay Slum*. Bloomington: Indiana University Press, 2007.
63. Sen, Shoma. 'The village and the city: Dalit feminism in the autobiographies of Baby Kamble and Urmila Pawar', *Journal of Commonwealth Literature* 54: 1 (2019): 38–51.
64. Sinha, Mrinalini. *Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century*. Manchester and New York: Manchester University Press, 1995.
65. Sinha, Subir, Gururani, Shubhra & Greenberg, Brian. 'The "new traditionalist" discourse of Indian environmentalism'. *Journal of Peasant Studies* 24: 3 (1997): 65–99.
66. Sinha, Subir. 'The Long March from the Margins: Subaltern Politics, Justice, and Nature in Postcolonial India', in *The Borders of Justice*, Etienne Balibar, Sandra Mezzadra, Ranabbir Samaddar, eds. Philadelphia: Temple University Press, 2012; 79–98.
67. Sharma, Mukul. 'Dalits and Indian Environmental Politics', *Economic and Political Weekly*. Vol. XLVII: 23 (2012a): 46–52.
68. Sharma, Mukul. Green and Saffron: Hindu Nationalism and Indian Environmental Politics. New Delhi: Permanent Black, 2012(b).
69. Sivaramakrishnan, K. 'Ethics of Nature in Indian Environmental History.' *Modern Asian Studies* 49: 4 (2015): 1261–1310.
70. Sivaramakrishnan, K. *Modern Forests: Statemaking and Environmental Change in Colonial Eastern India*. New Delhi: Oxford University Press, 1999.
71. Stewart, Tony K. *Fabulous Females and Peerless Pirs: Tales of Mad Adventure in Old Bengal*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
72. Sur, Malini. 'Battles for the Golden Grain: Paddy Soldiers and the Making of the Northeast India-East Pakistan Border (1930–1970)', *Comparative Studies in Society andHistory* 58: 3 (2016): 804–832.
73. Sur, Malini. 'Danger and Difference: Teatime at the northeast India-Bangladesh border', *Modern Asian Studies* 53: 3 (2019): 846–873.

74. Sur, Sayantani. '*Garbha Sanskar* and the Politics of Masculinity in West Bengal'. *Economic and Political Weekly*. Vol. LIII: 5 (2018): 20–22.
75. Srinivasan, Krithika. 'Remaking more-than-human society: Thought experiments on street dogs as "nature"', *Transactions of the Institute of British Geographers* 44 (2019): 376–391.
76. Thiara, Nicole & Misrahi-Barak, Judith. 'Editorial: Why should we read Dalit literature?', *The Journal of Commonwealth Literature*. 54: 1 (2019): 3–8.
77. Thorpe, David. 'The Importance of Ecotones', posted on 16/01/2014 on his blog: https://www.eoi.es/blogs/davidthorpe/2014/01/16/the-importance-of-ecotones/. Accessed on 1st June 2019.
78. Turner, Victor W. *Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1974.
79. Vasan, Sudha. 'Consuming the Tiger: Experiencing Neoliberal Nature', *Conservation and Society* 16: 4 (2018): 481–492.
80. Van der Veer, Peter. *Hindu Nationalism: Hindus and Muslims in India*. Berkeley: University of California Press, 1994.
81. Viveiros de Castro, Eduardo. 'Images of Nature and Society in Amazonian Ethnology', *Annual Review of Anthropology* 25 (1996): 179–200.
82. Willerslev, Rane. Soul Hunters: Hunting, Animism and Personhood among the Siberian Yukaghirs. Berkeley: University of California Press, 2007.
83. Yang, Anand A. 'Sacred symbol and sacred space in rural India: Community mobilization in the "anti-cow killing" riot of 1893'. *Comparative Studies in Society and History* 22: 4 (1980): 576–596.
84. Yeo, Jun-Han & Harvey NEO. 'Monkey business: human–animal conflicts in urban Singapore', *Social & Cultural Geography* 11: 7 (2010): 681–699